গ্রাম্য উপাখ্যান

৺রাজনারায়ণ বসু প্রণীত।

Sweet......! loveliest village of the plain,
Where health and plenty cheered the labouring swain;
Where smiling spring its earliest visit paid,
And parting summer's lingering blooms delayed;
Dear lovely bowers of innocence and ease,
Seats of my youth, when every sport could please,
How often have I loitered o'er thy green,
Where humble happiness endeared each scene;
How often have I paused on every charm
The sheltered cot, the cultivated farm,

* * * * *
* * * * *

Sweet smiling village! loveliest of the lawn,
Thy sports are fled, and all thy charms withdrawn

* * * * *

A time there was,......................................
When every rood of ground maintained its man:
For him light labour spread her wholesome store
Just gave what life required, but gave no more:
His best companions, innocence and health;
And his best riches, ignorance of wealth.

Goldsmith.

১৯১৪ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা।

কুন্তলীন প্রেস,
৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ;
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
রায় এম্, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স
৭৫।১।১নং হ্যারিসন রোড হইতে
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপন।

১২৯০ সালে "সুরভী" নামীয় পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু লিখিত "গ্রাম্য উপাখ্যান" ও "চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ ভ্রমণ" এই প্রবন্ধদ্বয় এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।
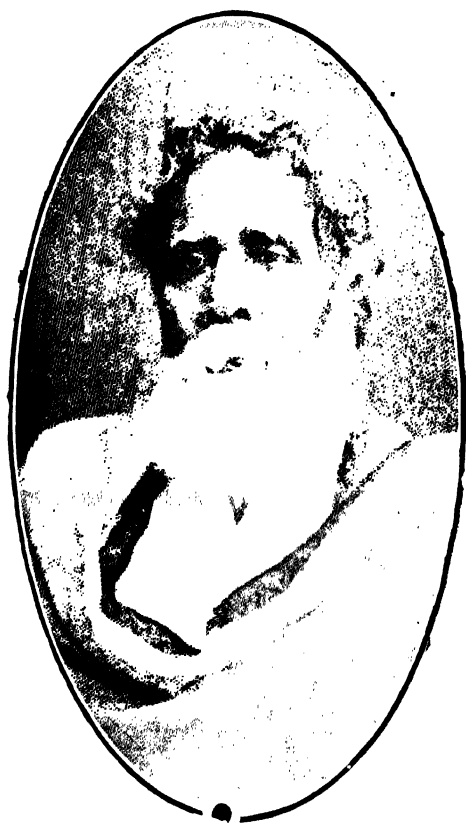
স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু।

RAJ NARAIN BOSE. (1896.)

Of his many portraits given in this volume, the one facing p. 64 (probably taken in 1889) is the most expressive. The deep pensive eyebrows and steady gaze are no doubt brooding over man's infirmities, looking straight into the hearts of things, and tearing off the masks of hypocrites. But there are just a twinkle lurking in the eye, a curve in the majestic sweep of the nose, an elevation of the nostrils, which indicate that the judge has infinite humour and will not be hard upon us, for he knows all and has pity for all. The broad massive forehead marks out the stern champion of truth and opponent of sham ; but the waving hair and wealth of beard and moustache framing the face betoken the patriarch standing on an ethereal height whence he is looking graciously down on frail men engaged in their puppet-show of life. Such was Raj Narain Bose, the Grand Old man of Baidyanath, with the record of a well-spent life behind him and serenely facing the prospect of eternity.

BABU JADUNATH SARKAR,

Modern Review 1909.

রাজনারায়ণ বসু।

"ছেলেবেলায় রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুল দাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে, কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে ব্যক্তি ছোট তাহার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মত হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমন কি, প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই। তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না —না বয়সের গাম্ভীর্য্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখ কষ্ট, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। একদিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর একদিকে দেশের উন্নতি সাধন করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই কত রকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান্ করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। রিচার্ড-সনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরাজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা

ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি মাটিরমানুষ, কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ, সে তাঁহার সেই তেজের জিনিষ। দেশের সমস্ত খর্ব্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন—গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না,—

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

এই ভগবদ্ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্য-মধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।”

“জীবন-স্মৃতি”
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজনারায়ণ বসু।

প্রাচীন-নবীন যুগ সঙ্গমের জলে
স্নান করি' উঠি মুক্ত সৈকত শেখরে,
যে বিপ্লব দেখেছিলে সমাজের স্তরে,
সাহিত্যে, শিক্ষায়, ধর্ম্মে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিবলে,
আঁকিয়া সে স্মৃতি-চিত্র যতনে বিরলে,
বিমল রহস্য-রাগে সুরঞ্জিত করে',
উদার অন্তরে, ভক্তি অনুরাগ ভরে,
অর্পিয়াছ মাতৃভাষা চরণ-কমলে।

আলোক-আলেখ্য তব আত্ম-বিবরণ,
একাল ও সেকালের দর্পণ উজ্জ্বল,
ইতিহ অভাব বঙ্গে করিয়া পূরণ,—
হে মনস্বী, কর্ম্মবীর, ধর্ম্মাত্মা, সরল,—
তোমার জীবন-কথা রাখিবে স্মরণ,
স্বদেশ-প্রেমিক তুমি সুহৃদ-বৎসল!

দর্শক পত্রিকা,
৪ঠা ভাদ্র, ১৩২১।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ

ভূমিকা।

"A great man is the product of a great age."
"A great man is not born without a great mission."

১২৮৮ সালে সুপ্রসিদ্ধ শ্রদ্ধাস্পদ ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় স্বাস্থ্যলাভার্থ কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত বৈদ্যনাথ দেওঘর নামক স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই স্থানে বাসকালে তিনি তাঁহার শেষ জীবনে রচিত 'সারধর্ম্ম', 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' 'তাম্বুলোপহার' ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল রচনা করেন।

১২৯০ সালে তাঁহার সুযোগ্য ও সর্ব্বগুণান্বিত জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺যোগীন্দ্রনাথ বসু সুরভী নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। উত্তরকালে যোগীন্দ্রনাথ বসু ইংলণ্ডে ও এমেরিকায় ইংরাজি ভাষায় প্রতিভাশালী লেখক বলিয়া সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রের ইংরাজ ও এমেরিকান সম্পাদকগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কিশোর জীবনকালে, বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত এই সাপ্তাহিক সুরভী পত্রিকাও বিবিধ সারগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ বিষয় প্রকাশিনী পত্রিকা স্বরূপে তৎকালে বঙ্গদেশে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার তৎকালীন নানা বিষয়ক কার্য্যে ব্যস্ত জীবনের অবসরকালে বিবিধ সারবান রচনা প্রকাশ পূর্ব্বক এই সুরভী পত্রিকার পরিপুষ্টি সম্পাদনে সহায়তা করিতেন। সুরভী পত্রিকায়

বহুবিধ রচনা প্রকাশের সহিত, তিনি তাঁহার নিজ জন্মভূমি বোড়াল গ্রামের তাঁহার সময়ের উর্দ্ধতন দেড় শত বৎসরের পূর্ব্বেকার হইতে তাঁহার নিজ বাল্য জীবনেব সমকালীন অধিবাসিবর্গের সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক এবং সাধারণ জীবন যাপন সম্বন্ধে "গ্রাম্য উপাখ্যান" শিরস্ক রচনাবলী ওজস্বী ও মধুর ভাষায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করেন। তাঁহার এই "গ্রাম্য উপাখ্যান" শিরস্ক রচনাবলী সমূহে একদিকে যেরূপ তাঁহার নানা বিষয়িণী বিপুল পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় সেইরূপ অন্যদিকে তাঁহার সময়ের দেড় শত বৎসরের পূর্ব্বেকার হইতে তাঁহার বাল্য জীবনের সমকালীন সাধারণ বাঙ্গালী সমাজের সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক এবং সাধারণ জীবন যাপন প্রথা সম্বন্ধীয় সুচিত্রিত জীবন্ত আলেখ্য আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। গ্রাম্য জীবন যাপন প্রথাই তৎকালীন বাঙ্গালী জাতির প্রাণ স্বরূপ ছিল। বর্ত্তমান কালিন ইউরোপীয় সভ্যতার প্রথম নিদর্শন নাগরিক জীবন যাপন প্রথা সে কালে একান্ত ধারণার অতীত ছিল। তৎকালের বাঙ্গালী জাতির জাতীয় জীবনের ইতিহাস অন্বেষণ করিতে হইলে, তাঁহাদের তৎকালীন গ্রাম্য জীবনের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা সঙ্গত। বসু মহাশয় লিখিত তাঁহার স্বগ্রামের গ্রাম্য উপাখ্যানে তৎকালীন সমগ্র সাধারণ বাঙ্গালী জাতির জাতীয় জীবন চিত্রেরই সঠিক উজ্জ্বল

আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার গ্রাম্য উপাখ্যানে চিত্রিত তৎকালীন সাধারণ বাঙ্গালী জাতির জাতীয় চরিত্র চিত্র বর্ত্তমান সময়ে কল্পনা স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে। বসু মহাশয় বর্ণিত তৎকালীন বাঙ্গালী জাতির জাতীয় চরিত্র চিত্র অনেকাংশে পুরাকালীন ভারতবর্ষীয় জাতীয় জীবনের আভাষে ওতপ্রোত ও তেমনি দয়া, দাক্ষিণ্য, আতিথেয়তা ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের পুত হোম ধুম স্নাত। অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কালে, তাঁহাদের রাজ সভায় অবস্থিত গ্রীক রাজদূতগণের লিখিত ভারতবর্ষের বিবরণী গ্রন্থে তৎকালিন হিন্দু জাতির জাতীয় চরিত্রের দয়া, দাক্ষিণ্য, আতিথেয়তা, ও নৈতিক চরিত্রের সম্বন্ধে পরিশুদ্ধ নিখুঁত বিবরণ দৃষ্ট হয়। বসু মহাশয় চিত্রিত গ্রাম্য উপাখ্যানে তৎকালীন সাধারণ বাঙ্গালী জাতির জাতীয় চরিত্র চিত্র অনেকাংশে গ্রীক রাজদূতগণ বর্ণিত তাঁহাদের হিন্দু পূর্ব্ব পুরুষগণের যে অবিকল সঠিক আদর্শ মাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে একটি সামান্য গণ্ড-গ্রামের অধিবাসিবর্গের সামাজিক নৈতিক ও আর্থিক অবস্থা এবং চরিত্র চিত্র কিরূপে তৎকালীন সমগ্র বাঙ্গালী জাতির জাতীয় চরিত্র স্বরূপে পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু ইংরাজিতে একটি কথা আছে যে কোন একটি সমগ্র জাতির জাতীয় চরিত্র অধ্যয়ন করিতে যদি কেহ অগ্রসর

হন, তাহা হইলে সেই জাতির কোন একটি নগর কিম্বা ক্ষুদ্র পল্লীর অধিবাসিবর্গের সামাজিক ও নৈতিক চরিত্রের সহিত পরিচিত হইলে তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। কেন না একটি মাত্র নগর কিম্বা পল্লিবাসির জীবন চিত্রই কোন একটি সমগ্র জাতি সমষ্টির সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারবান ইতিহাস মাত্র।

এক্ষণে এস্থলে আমরা বসু মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান পূর্ব্বক এই ভূমিকা সমাপ্ত করিব। কিন্তু বসু মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন চিত্র প্রদান করিবার পূর্ব্বে বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসের Modern Review পত্রিকায় বাবু যদুনাথ সরকার লিখিত Rajnarain Bose শিরস্ক ইংরাজি প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি প্যারাগ্রাফ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি কি প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে এই স্থলে Modern Review হইতে উদ্ধৃত কয়েকটী মাত্র প্যারা হইতে তাহার স্পষ্ট আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

His Life.

Raj Narain Bose was born in September, 1826, at a village 12 miles from Calcutta. He entered David Hare's School at the blissful dawn of English education in Bengal, and thence in 1840 went up to the old Hindu College, where he soon distin-

guished himself by his knowledge of English and fondness for literature, and carried off many prizes and scholarships. Perhaps, there never was a College which contained at the same time so many brilliant youths all destined to attain to the highest eminence in the various spheres of life, as the Hindu College of that year. Among Raj Narain's fellow-students were Michel Madhusudan Dutt, the poet, Peary Churn Sircar, the educationist and temperance organiser, Jnanendra Mohan Tagore, the first Indian barrister, Bhudev Mukherji, sometime acting Director of Public Instruction, Bengal, Nil Madhav Mukherji, the Doctor, Jagadish Nath Roy, the first Indian District Superintendent of Police, Gobinda Chandra Dutt, the poetic father of Miss Toru Dutt, and many more. And we can imagine no better proof of Raj Narain's intellectual powers than this that in that troop of giants he was not the least eminent. Leaving College in 1844 he embraced Brahmoism and two years afterwards entered the service of the Adi Brahmo Samaj, at first as English translator of the *Upanishads*. In May 1849, he became Second English Teacher at the Sanskrit College,

Calcutta, and thence in February 1851, he joined Midnapur School as Headmaster. This post he retained till March 1866, when he was invalided, and these 16 years were the crowning period of his active life. Thereafter he travelled up country in quest of health and at last settled at Baidyanath, where his house became the Mecca of Bengali reformers and lovers of literature, attracted thither by the fame of his wonderful humour and fond of anecdotes.

উদ্ধৃত প্যারা হইতে দৃষ্ট হইতেছে যে তিনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত বোড়াল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি স্বগ্রামের পাঠশালায় পাঠ সমাপন পূর্ব্বক কলিকাতাতে তৎকাল প্রসিদ্ধ হেয়ারস্কুলে প্রথমে ভর্ত্তি হয়েন। কিছুকাল হেয়ারস্কুলে অধ্যয়নের পর, তদানীন্তন নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি কলেজের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রস্বরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। সপ্তদশ বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি হিন্দুকলেজের সর্ব্বশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। কলেজে অধ্যয়নকালে, তাঁহার সেই কৈশোর কালের জীবনেই তাঁহার হৃদয় স্বদেশ প্রেমে মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের তিরোধানের পর,

তাঁহার কলেজে অধ্যয়ন জীবনকালে বঙ্গদেশে সর্ব্ববিষয়িণী সংস্কারের বিপুল বিপ্লব মন্ত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। দুর্যোগগ্রস্ত নিশীথ অন্ধকারের মধ্যে, প্রভাতের প্রথম আশাজ্বল কিরণরেখা পতিত হইলে, সেই বিভীষিকাময়ী নিশীথের অন্ধকার মধ্যে যেরূপ একটা বিপুল বিপ্লবের আলোড়ন উপস্থিত হয়, সেইরূপ পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতার প্রথম রশ্মিপাতে, অজ্ঞানতাপূর্ণ বঙ্গদেশে তৎকালে একটা বিপুল বিপ্লবের তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। চারিদিকে বিপ্লবের ঝটিকা রব উত্থিত হইয়াছিল। যাহা কিছু প্রাচ্য, তাহাই অসার ও কুসংস্কারাপন্ন অসভ্য জাতির মস্তিষ্ক প্রসূত। প্রাচ্য হিন্দুজাতির সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম্ম ও সমাজনীতি সমস্তই চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অননুমোদিত কুসংস্কার বিকৃত হিন্দু আচার প্রথা সমূলোৎপাটিত করিতে হইবে; অসার হিন্দুসাহিত্য, ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার পথ হইতে ফিরাইয়া দেশকে পরিশুদ্ধ ও উন্নত সভ্যতানুমোদিত পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রে কৃতবিদ্য করিয়া তুলিতে হইবে, সত্যপথভ্রষ্ট হিন্দুসমাজের বিষাক্ত বায়ু সেবনে হিন্দুজাতিকে নির্জীব করিবার পথে বিপুল প্রতিবন্ধক উত্থিত করিতে হইবে। তৎকালের হিন্দুকলেজের অধ্যায়ী ছাত্রবৃন্দের চিত্ত, হিন্দু সমাজের এইরূপ আমূল সংস্কার মন্ত্রে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুসমাজের জীর্ণ ভিত্তির উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা

ও জ্ঞানের বিজয়পতাকা প্রোথিত করিবার মানসে বঙ্গদেশের তৎকালীন আশাস্থল হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিকৃতভাবাপন্ন প্রাচীন হিন্দুসাহিত্য, শিল্প ও সভ্যতার জীর্ণ ভিত্তিগাত্রে, কোন স্থানে যে উন্নত প্রণালীর Artএর সমাবেশ থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের ধারণার অতীত ছিল। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিত "সেকাল একাল" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে যেদিন হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ মুসলমানের দোকান হইতে প্রথম বিস্কুট ক্রয় করিয়া আহার করেন, সেদিন তাঁহারা রাজপথ কাঁপাইয়া হিপ্ হিপ্ হুররে ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিলেন। মুসলমান দোকানের বিস্কুট আহার করিয়া, হিন্দুসমাজের কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, তাঁহারা এই উল্লাসে রাজপথ কাঁপাইয়া বিজয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিলেন। সমাজবিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত এই যুবকবৃন্দের অগ্রণী হইয়াও, রাজনারায়ণ বসু মহাশয় কোন্ পথে চলিয়াছিলেন, তাহা আমরা Modern Reviewতে বাবু যদুনাথ সরকার লিখিত Raj Narain Bose শিরস্ক প্রবন্ধ হইতে এবং ১৯০৯ সালের নবেম্বর মাসে উক্ত পত্রিকায় বাবু জীতেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় লিখিত Study শিরস্ক প্রবন্ধ হইতে পুনরায় কয়েকটি প্যারাগ্রাফ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। উহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে বিপ্লব ঝটিকার স্রোতে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে ছুটিবার

পরিবর্ত্তে, অনাময় অন্তঃকরণে কোন্ সত্য পন্থার তিনি অনুসরণ করিয়াছিলেন—

Preacher of Nationalism.

To the largest circle of men, in fact to all outside the Brahmo Samaj, Raj Narain Bose was best known as a staunch old Nationalist. The first fruits of English education in Bengal were a disgust with Indian dress, customs, religion, and even language, and a passion for everything English. Foremost among the Anglo-maniacs stood Madhusudan Dutta, who used to say, "I can speak in English, write in English, think in English, and shall be supremely happy when I can *dream* English ! He abjured his native faith, dress, society and even name ; but with what result ? His only title to fame now is as a *Bengali* poet ! Another was Jnanendra Mohan Tagore, who gave up his home and kindred and settled in England with the (courtesy) title of Prince Tagore, and whose vast ancestral estates are now being enjoyed by an English attorney's son named Ramsden.

To Raj Narain Bose belongs the credit of heading the reaction against this spirit

and preaching the gospel of nationalism to the educated public. A philanthropist to the core of his heart, he still held

> He who loves his country most
> Is the truest cosmopolite.

Mr. Townshend of the *Spectator* or Rudyard Kipling would probably p int the finger of scorn at his actions as another case of educated Indians "going fantee,"—as the negroes of West Africa do, when they suddenly discard civilised dress and ways and revert to their ancestral barbarism with unmixed glee. But in our eyes there is no nobler feature in the career of Raj Narain than his passionate lifelong endeavour to diffuse among his less fortunate brethren the new thoughts and new spirit which he had got from his English teachers,—to raise the entire Indian community to his own level, instead of abjuring their society and joining the "Ingo-Bangas" who tried to pass themselves off as Englishmen and succeeded only in being mistaken for third—rate Eurasians. Raj Narain's everpresent thought was 'I am one of the people. How can I make them realise our national one-

ness ?' For this as early as 1861 he proposed the formation of a "Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal" and a *Hindu Mela* or National Exhibiton, which were long afterwards realised by his friend Navagopal Mitra (pp. 83, 110, 208, and 215). For this he delivered his famous lecture on *the Superiority of Hinduism*, which galvanised the Indian society of the day and excited ludicrous consternation and anger in Lal Behari De and other dreamers of the vain dream of *nirvana* in complete Anglicisation. (Pp. 86—92). For this, Brahmo as he was, he advocated a Universal Hindu League, for uniting all parts of India on the platform common to all sects. (See his pamphlet *Old Hindu's Hope*, 1889). For this he insisted on the use of pure Bengali, and by a fine of one pice for every English word used penalised that mixture of Bengali and English* in our familiar conversation of

* In this matter we may not go the entire length of our hero's honest enthusiasm. A verbal purist of an earlier generation might have fined Raj Narain for the many Arabic words used in his autobiography!

which Risley has recently made such fun in his *People of India.*

At his suggestion Jagadish Nath Roy organised in 1875, the first College Reunion or "Old Boys' Day" of the Hindu College (p. 205). How far Raj Narain was in advance of his time will be shown by the fact that the Presidency College formed its Old Boys' Association only in February 1909!

Before Swadeshi.

"Babu Raj Narayan Bose, a man of the most striking and remarkable personality, and one who realised in his life the nationalistic aspirations of our country long before they found any definite or articulate expression among any considerable body of men. He was called in his time 'the grandfather of Indian Nationalism,' and right well did he deserve that name.

He lived at a time when Westen influences and Western culture were first making head-way in the country, when their glamour and fascination had laid under its spell all young, ardent, and generous minds, and when the best spirits of the

land were eager to mould their national life after the models of the West. But Raj Narayan Bose, though he was himslf steeped in the culture and education of Europe, though his soul burned with a generous enthusiasm to reform the social abuses of his country, yet never lost the balance and sanity of his mind nor shut his eyes to the superior spirituality of Hindu civilization. He wrote and spoke most forcibly on 'The Superiority of Hinduism' and on the sad contrast between the 'Past and Present', established societies for the conservation of the national principle, and instituted measures for improving the physique of the Bengalis. In all he said and did, there was that passionate attachment to his country and his race, that strong resentment of the spurious affectation of superiority on the part of an alien people, which form a portion of that rich heritage of intellectual capacity, moral integrity, and spiritual fervour which...... that most remarkable and original old man........

But Raj Narayan Bose was something more than the passionate and impulsive

lover of his country ; and certainly he was no man to cling blindly to the old, worn-out rags of the past. His was a most complex and composite personality ; and together with his intense love for India and things Indian, there was in his character a hatred of all sham and untruth, of whatever might hinder the free development of a virile manhood in the country. Thus there was realized in his character that rare and curious combination—the ardent, almost militant defender of his country and the institutions thereof dwelling side by side with the aggressive social reformer who shocked the effete orthodoxy of his time by the plainness of his speech and the directness of his action."

উপরে উদ্ধৃত প্যারাগ্রাফ সমূহ হইতে দৃষ্ট হইতেছে যে তাঁহার সহপাঠি যুবকবৃন্দের ন্যায়, একেবারে ধ্বংশ নীতির দণ্ডাঘাতে সমাজ ভিত্তী গাঁথুনী চূর্ণ করিবার পন্থায় তিনি ভ্রমেও পদার্পণ করেন নাই। যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর, তাহাই রক্ষা করিয়া এবং যাহা কিছু অসার ও জীর্ণ তাহা পরিহার পূর্ব্বক, ভারতীয় সমাজ বনিয়াদ সুদৃঢ় ও মজবুত করিয়া গঠন করনার্থ, তিনি বাহির

হইতে তদুপযোগী মাল মসলা সংগ্রহ করিবার পন্থারই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে আমরা বসু মহাশয়ের ব্যক্তিগত জীবনের সম্বন্ধে আরো কয়েকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্ব্বক, এই ভূমিকা শেষ করিব। তাঁহার কলেজ পরিত্যাগের এক বৎসর পর অষ্টাদশ বৎসর বয়ক্রম কালে, তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার পিতার বয়ক্রম তেতাল্লিশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার পিতা নন্দকিশোর বসু, রাজা রাম-মোহন রায়ের শিষ্য, ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম মতাবলম্বি ছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানে কৃতবিদ্য করিবার পর, ভারত-বর্ষের তৎকালিন অক্সফোর্ড কাশিতে সংস্কৃত ও পাটনা নগরে আরবী ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিবার জন্য পুত্রকে প্রেরণ করিতে, তাঁহার পিতার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। অকালে কালগ্রাসে পতিত না হইলে, তিনি তাঁহার এই ইচ্ছা জীবনে সাধন করিয়া যাইতে পারিতেন। পিতার মৃত্যুর পর, সেই অল্প বয়সে তিনটি শিশু ভ্রাতা, বিধবা মাতা ও বিপুল পরিবারের ভার তাঁহার উপর পতিত হয়। পিতা মৃত্যু সময়ে তাঁহার শোকার্ত্ত পত্নীকে সান্ত্বনা প্রদানার্থ বলিয়াছিলেন—"আমি চলিলাম, কিন্তু কৃতবিদ্য পুত্র রাজনারায়ণ রহিল। আমার অবর্ত্তমানে সেই তোমাদের দেখিবে ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।" পিতৃ বিয়োগের পর, রাজনারায়ণ বসু মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া কিছু দিন

সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতা করেন। কলেজ হইতে বহির্গত হইবার পর, তিনি রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের সম্পর্কে আসিতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাস, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে, একটি নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করে। কলেজে অধ্যয়ন কালে তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাস একটা অনির্দ্দিষ্ট পথে আন্দোলিত হইতেছিল। বাইবেল অথবা কোরাণ অনুমোদিত এই উভয় ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করিলে, প্রকৃত সত্য ধর্ম্মের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা নির্ণয়ে তিনি সংশয় আন্দোলিত চিত্ত হইতেছিলেন। কলেজ হইতে বহির্গত হইবার পর ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণে তাঁহার অন্তরের ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধিয় সমস্ত সংশয় ভাব বিদূরিত হয়। কলেজে অধ্যয়ন কালে, সমাজ সংস্কার বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী ও দৃষ্টান্ত স্বরূপ হওনার্থ, তিনিই সর্ব্ব প্রথম বিধবা বিবাহ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা, তাঁহার বিধবা বিবাহের সঙ্কল্পের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া,—"আমাদের দেশে এখনো এরূপ দুঃসাহস জনক কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই" তাঁহাকে এই উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক এই কার্য্য হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতা কার্য্য কালে, তিনি প্রথম ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সেই সময়ের প্রদত্ত বক্তৃতা সমস্ত, "রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা" নামে

প্রসিদ্ধি লাভ করে। শুনা যায় যে বাবু কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার রক্তৃতা পুস্তক পাঠে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি মেদিনীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ পূর্ব্বক, তথায় গমন করেন। মেদিনীপুরই, তাঁহার মহৎ জীবনের কার্য্যাবলীর সর্ব্ব প্রথম স্ফুরন ক্ষেত্র। মেদিনীপুরে তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলী কি ভাবে সর্ব্ব প্রথম বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার নিদর্শন আমরা Modern Review হইতে পুনরায় এস্থলে সঙ্কলন করিতেছি—

Teacher and Reformer.

Raj Narain's name is lovingly cherished at Midnapur for his work as Head Master. His heart was in his work, and like Goldsmith's village preacher he declined preferment elsewhere rather than leave his beloved flock. "In 1856, Mr. J. H. Young, Commissioner of Burdwan, came on tour to Midnapur and was highly pleased with my School and conversation. In the Annual Report he recommended me for a Deputy Collectorship. If I had set about a little I could have got the post. But I loved Midnapur so well that I declined to leave it. On Peary Churn Sircar being promoted, the Director offered me the

Headmastership of Hare School vacated by him. But I again declined to leave my work of improving dear Midnapur....The Director exclaimed about me, 'Don't talk of him, he is a madcap; he wants neither pay nor promotion.' (p 105) [What higher proof of disinterested love of duty can we imagine than this?] It was my principle as a teacher to guide the boys by means of love. Early in my career I inflicted corporal punishment on one or two boys, but afterwards gave it up altogether. While teaching them I used to narrate instructive but interesting stories, which drew their hearts to me. I never told them the meaning of a passage outright, but drew it out of them by questioning. But I hear that now-a-days our College students are mere listeners, the professor lectures and they take down notes. The teacher does not ask them any question nor do they ask him. I hate this system of teaching. (P. 73) Besides establishing a debating club for my boys, I constructed a Racket Court for their physical exercise by raising public subscriptions, without soliciting any aid from Government."...During the 16 years of his Headmastership the

strength of the School rose from 80 to 300 and the number of teachers doubled. Year after year his boys carried off university scholarships by competition. Nor were his beneficent energies confined to the School. He took a leading part in establishing a Girls' School, a Technical School, a Temperance Association, a Public Library and many clubs for public improvement in various ways. No philanthropic project, no scheme of reform, but had Raj Narain among its promoters. What immense good he did by reclaiming drunkards will be seen from pp. 79—85. In the field of social reform he was equally bold and active: the 3rd and 4th widow marriages celebrated by Vidyasagar were arranged by Raj Narain between his cousin and his brother and two widows, in defiance of the entreaties of his orthodox relatives and the threats of his neighbours. "The people of my native village cried out, 'If Raj Narain Bose comes here we shall stone him.' I replied, 'That would highly please me. I knew the Bengali race to be apathetic. If they act thus, I shall conclude that on being convinced of the utility of widow marriage they

would support it as vigorously as they are now opposing it." (P. 100).

ষোড়শ বৎসর, তাঁহার প্রথম কার্য্যক্ষেত্র, মেদিনীপুরে অবস্থান করিবার পর, শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন, মেদিনীপুর স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। মেদিনীপুর হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক, স্বাস্থ্য লাভার্থ তিনি ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ পরিভ্রমণ করেন। ভারতবর্ষের নানা দেশ ভ্রমণ কালে. সকল স্থলেই, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, সমাজ সংস্কার ও স্বদেশ হিতৈষণা মন্ত্রে লোককে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেন। নানা দেশ ভ্রমণের পর, তিনি কলিকাতায় আসিয়া দশ এগারো বৎসর পর্য্যন্ত এস্থানে বাস করেন। কলিকাতা অবস্থান কালে, তিনি বিদেশী শিল্প ও পণ্য দ্রব্যে প্লাবিত বঙ্গদেশে পুনরায় স্বদেশী শিল্প দ্রব্যের প্রচলনার্থ, তাঁহার বন্ধু স্থানীয় বাবু নবগোপাল মিত্রের সহিত, এক যোগে কলিকাতায় প্রথম হিন্দুমেলা উদ্ঘাটন করেন। বাবু নবগোপাল মিত্র, তাঁহারি উপদেশ অনুসারে, হিন্দুমেলা অর্থাৎ স্বদেশী শিল্প মেলার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে প্রাণ পত্তন করেন। দেশে স্বদেশী শিল্প দ্রব্যের বহুল প্রচলনার্থ, হিন্দুমেলার প্রাণ প্রতিষ্ঠা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়েরই কীর্ত্তি, অপর কোন ব্যক্তির নহে। তৎকালে দেশে স্বদেশী দ্রব্যের সমাদর ও প্রচলনার্থ হিন্দু মেলার অভিনব উদ্ভাবন বসু মহাশয়ের স্বদেশ

প্রীতির গভীর নিদর্শনের অপর একটি অভিব্যক্তি। কলিকাতা অবস্থান কালেই তিনি সেকাল একাল, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা সকল প্রদান করেন। "সেকাল একাল" ও "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ে, যখন তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন, তখন বঙ্গদেশে গভীর আন্দোল্বন উপস্থিত হয়। তাঁহার সেকাল একাল ও হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্টতা বিষয়ে বক্তৃতা· সম্বন্ধে বঙ্গদেশে গভীর আন্দোলনের উল্লেখ করিয়া মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছিলেন "রাজনারায়ণ বাবু কিছু একটা বলেন আর দেশে হুলুস্থূল পড়িয়া যায়"।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধিয় তাঁহার মতামত, এবং ইহার সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্যাবলীর যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদনার্থ আমরা পুনরায় Modern Review যদুনাথ সরকার লিখিত প্রবন্ধ হইতে এই সম্বন্ধে কয়েকটি প্যারাগ্রাফ উদ্ধৃত করিতেছি—

Evolution of the Brahmo Samaj.

Raj Narain was one of the builders of the Brahmo Samaj and its doughtiest controversialists and sweetest preachers. In his memoirs we get a very interesting and fresh history of the evolution of modern Brahmoism, and this history we shall review here. Many who took part in the controversy

which shook and split up the new sect are still alive, and the heat engendered by it has not yet entirely cooled. But the cause of truth is best served by having a straight talk, "extenuating nothing, setting down naught in malice." The present writer, as one standing outside the Brahmo Samaj, is best qualified to handle the subject with a perfect detachment and freedom from the suspicion of partisanship.

Ram mohun Roy, the founder of Brahmoism, regarded himself as a Hindu, and his creed as only the restoration of Hinduism to its pristine purity, just as the early Protestants held themselves to be no schismatics but the only true Christians. With him the Vedas were revealed Scriptures, and his followers call themselves *Brahmajnani Hindus, or Vedantist Hindus* (pp 6, 44 & 118) The basis of their faith was the monotheism free from idolatry which the *Upanishads* taught. Caste was still observed (intermarriage and not interdining is the crucial test of caste). Thus, the first group of Brahmos merely abjured idol worship and retained other Hindu beliefs and practices almost intact.

Here I may observe that if Brahmoism meant mere negation of image-worship, it could have claimed no originality, for such a *doctrine* already existed in the bundle of faiths labelled as Hinduism. The distinctive merit of Brahmoism must, therefore, be *not its doctrinal side,* not refusal to bend the knee before idols,—for the dogma of monotheism was an old one in India. With what new elements then has Brahmoism enriched Indian life? My answer is, *social* and not religious. First, the abjuration of caste in practice, while clinging to an *Aryan* creed and philosophy and rejecting (except in an eclectic form) the Semitic faiths of Muhammad and Christ. Secondly, a close copy of the religious and *moral organization* (not dogma) of the Protestant peoples of North Europe, *viz.*, regular weekly religious service in congregation, daily family prayer, a scrupulous and ever vigilant protection of children from indelicate words, sights and literature, adult marriage (and the moral restraint which it implies), persistent and deliberate effort for the development of character by systematic preaching and the moral training of the young, the use of the

vernacular in rituals, and sermons at baptism, marriage and funeral,—tending to make religion a part of daily life and to keep alive in the heart an ever present consciousness of it,—the enforcement of method and orderliness in life, the letting in of "light and sweetness" into poor homes by the artistic culture of women folk. How very precious the second is as a factor of race improvement and how deeply though unconsciously Brahmo homes are influencing Hindu ones, time will fully show. But I can say that thoughtful Hindus are heartily sick of the religious chaos and vacuity in which they have been left by the passing away of the old order. Their priests and regular ceremonies have disappeared, and no new system, no organisation, has been founded for *regularly* ministering to their spiritual wants, especially the moral training of the young. A few spasmodic efforts in this direction have been made by Dharma Sabhas and Gita Societies, but they have not yet hit upon the right path. The organisation of a new and regular ministry is *the* problem of Hinduism to-day, and the Brahmo Church alone can throw light on its solution.

Devendra Nath Tagore began with a compromise; at his father's funeral he omitted to offer *pindas* (oblations to the manes of the dead) but performed the *dan-sagar* (gifts). "Many Brahman Brahmos used to take off their sacred threads at prayer, and immediately afterwards resume them!" (P. 63.) True, in 1850, a step forward was taken: the revealed origin of the Vedas was publicly denied. But it required all Raj Narain's exertions at Midnapur to "make some Brahmos give up idolatrous rites at their domestic ceremonies" (p. 77). Even Raj Narain defended caste: "I argued,—As every country and community has and will have class distinctions in some form or other, why blame the Indian caste system? Can you dine with your servant? Ramtanu Lahiri replied,—Yes, if he washes himself clean with soap" (p. 114). The fallacy of Raj Narain's analogy between European *classes* and Indian *castes* must be obvious to every thoughtful man. But he, with other early Brahmos, clung desparately to Hindu society and gloried in being called a *Hindu Brahmo* (P. 89). "Babu Dakshina Ranjan Mukherji (of Lucknow) was a

Brahmo, but thought it enough to read the *Upanishads* and sing hymns at service, as was the practice in Ram Mohun Roy's days. To him the Adi Brahmo Samaj was un-Hindu. But this view of his was wrong. How can we be other than Hindus as our chief Brahmo Scripture is composed of extracts from the Hindu Shastras?" (P. 118.) This attitude of the Adi Samaj became clearly defined in the difference with Kesav.

"In 1873 Devendra Nath Tagore introduced into the Brahmo Samaj as much of the ancient thread-investiture as could well be. In this new ceremony the novice was initiated in the Gayatri spell and invested with the sacred thread. If in Europe aristocrats can signify their high birth by wearing rampant lions on their coats of arms, I see no harm in such of our Brahmos as are of Brahman birth wearing the sacred thread as a token of their being spiritual aristocrats, the descendants of ancient Rishis...... We should only see to it that no connection is kept with idolatry. Devendra Babu invested his younger sons Somendra and Rabindra with the sacred thread. All the ceremonies of the Brahmanic

religion were observed [at the time] except idol worship. That day on my return to Calcutta from a village I went straight into the hall where the ceremony was being performed, as I did not know that [Devendra Babu] had *forbidden non-Brahmans to enter it.* Had I known of it I should not have sat down in the hall." (P. 199).

Now, it is well-known that Devendra Nath Tagore was opposed to the inter-marrage of castes. But it is news to us that he figured in the role of a high-priest of pagan Greece standing on the temple steps and shouting to non-Brahmans, "Hence, avaunt, ye profane herd! Ye cannot enter the shrine!" Brahmanic pride and contempt for the "lower castes" comes with better grace and greater logic from a stout old Hindu such as Bhudev Mukherji (see p. 121) than from the "Great Sage" of the Common Fatherhood of God and Brotherhood of Man.

We, however, do not presume to blame Devendra Babu. We know how hard it is to cut one's self adrift from old moorings and sail into unknown waters. Still, we must admit that the Sadharan Brahmo Samaj alone represents the logical development of

Brahmoism, and that their is no half-way house or halting place between it and (old) Hinduism, as the Adi and even Indian (Bharatbarshiya) Samajes fondly imagined.

Kesav Chandra Sen got disgusted with the Hindu leanings of the Adi Samaj. Raj Narain, the best exponent of that church, writes, "I consider the method of the Adi Samaj as the best for preaching Brahmoism among the Hindus. Brahmosim ought to be propagated in India on the basis of the sublime Vedas and Vedant." (P. 132) The Kesav-ites drew their inspiration from the Quran and the Bible; as Kesav's lieutenant said in a Town-hall speech, "We are Christianised Hindus and Hinduised Christians." But, to continue the narrative in Raj Narain's own words.—

"'Kesav Babu answered, 'I am ready to say that we are *not Hindus*.' ... What a sad day it was on which Kesav Babu said so. That day, as it were, two brothers quarrelled and parted company. One brother remained in the ancestral house, *viz.*, Hindu society; the other left its fold." (P. 186).

Kesav opened a new Church, and this was the second step in advance. But alas! as

surely as fame is the last infirmity of noble minds, man-worship * or *avatarism* is the first infirmity of ignoble minds. The separatists in their new Tabernacle were seized with a very old Indian disease: they began to worship Kesav and Pratap as new Prophets and mediators between lesser mortals and God! Then followed scenes which made every sane Brahmo blush in shame and every unbeliever roar with laughter. "After the service [in the Cawnpur Theistic Church] every Brahmo present clasped the feet of Protap Mazumdar and cried, 'Save me, lord! 'Intercede with God for me!' Then they came, as if ashamed, to clasp my feet. I slid back squatting and shouted 'Don't do it, it is improper.' Dr. A. K. De smiled at the scene (P. 134)... When Kesav Babu went to Simla *via* Monghyr, his disciples announced that he was an *avatar*. It was at Monghyr that he first developed into an *avatar*. To those who questioned him he replied, 'I will not stem the current of their faith.' ... One day I was

* The worship of an avator is quite different from the Carlylean hero worship.

talking with Devendra Nath Tagore about Kesav as an *avatar*, when he remarked, 'I wonder why Kesav is ambitious of the rank of an *avatar*. In this country the Fish and the Tortoise too are worshipped as *avatars*.! ... When Kesav Babu alighted at Allahabad on his return from Simla, there was quite a scene on the platform as his disciples rushed to clasp his feet and those of each other, while the European station-master looked on in amazement." (P. 136) Evidently the latter gentleman thought, 'Scratch a Brahmo and you will find a Hindu.'

Then came the Kuch Bihar marriage, when principle was sacrificed to expediency, * * * * Kesav claimed that he had acted under inspriration. But one must live in the age of miracles to believe that this inspiration had come from on high. The logical consequence of avatarism foll-ed the death of Kesav : the alter from which he used to preach was pronounced sacred and Pratap was prevented with unspiritual weapons from occupying it, lest it should be defiled ! The argument was presumably the same as the Shia contention that Ali,

the heir-at-law of Muhammad, was the true successor of the Prophet and that the first three Khalifas were usurpers, *i. e.*, the headship of religion is heritable like private property and the Founder's heir enters into possession of the Church "with the live stock in it." Among the Hindus the alter on which an idol has been installed thenceforth becomes too holy to be ocupied by men. Kesav's alter was similarly guarded from the defiling touch of Pratap or any other mortal. The difference between these two kinds of idolatry is not obvious to any intellect to which the light of the New Dispensation has not been vouchsafed.

Then the Sadharam Brahmo Samaj was formed in protest. It must have wrung Raj Narain's heart to see the infant church split up again, and the brethren hastening to fulfil the proverb, *Tin Kanaujia terah chulah* (three Kanauji Brahmans require 13 separate cooking-places between them)."

কলিকাতায় অবস্থান কালে, শারীরিক অবনতিগ্রস্ত বাঙ্গালী জাতিকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ করিবার উদ্দেশে তিনি এস্থানে এক ব্যায়ামাগার সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই ব্যায়ামাগারে অশ্বারোহণ ও অন্যান্য ব্যায়াম শিক্ষা প্রদত্ত হইত। কলিকাতায় এইরূপ নানাবিধ সদনুষ্ঠানসূচক

কার্য্যে; দশ এগারো বৎসর অতিবাহিত করিবার পর, পুনরায় মেলেরিয়া জ্বরে স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়াতে বায়ু পরিবর্ত্তন উদ্দেশে কলিকাতার কার্য্য ক্ষেত্র হইতে কিছু দিনের জন্য দেওঘরে গমন করেন। এই স্থানে নষ্ট স্বাস্থ্য পুনঃ লাভ করিবার পর, তিনি কলিকাতায় পুনঃ প্রত্যা-বর্ত্তনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দেওঘরে কার্য্যে ব্যস্ত জীবন ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হওয়া সত্ত্বেও, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে, সমাজ সংস্কার চিন্তায় ও সাহিত্য সেবাব্রত হইতে তিনি কখন বিরত হয়েন নাই। দেওঘরে অবস্থান কালে তিনি কত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগকে মধুর ও উচ্চ উপদেশ এবং ধর্ম্মপ্রাণতার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান ও আকৃষ্ট করিয়া লইতেন, এবং সমাজ সংস্কার ব্রতে, কত লোককে যে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেন তাহার সংখ্যা নাই। বঙ্গদেশের নবীন ও প্রবীণ সাহিত্য সেবীগণ, তাঁহার সহিত সাহিত্য বিষয় আলোচনা করিবার জন্য কত সুদূর স্থান হইতে দেওঘরে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার পদার্পণে বন্য ভূমি দেওঘর বঙ্গদেশে অল্পদিনের মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার দেওঘরের বসতবাটী, ধর্ম্ম ও জ্ঞানালোচনার সামগানে মুখরিত প্রকৃত ঋষি আশ্রমের ন্যায় পুণ্য ভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। কত স্বদেশ-সেবীগণ তাঁহার নিকট উপদেশ লাভের জন্য উপস্থিত হইতেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত "আনন্দমঠ" উপন্যাস পাঠ করিয়া তিনি বঙ্কিম বাবুকে এক পত্রে আন্তরিক গভীর আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া লিখিয়াছিলেন, "আপনার লেখনী অমর হউক।" আনন্দমঠ পাঠ করিবার পর বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের, "বন্দেমাতরম্ সুজলাং সুফলাং

এবং সপ্তকোটিধৃত খরকরবালে, কে বলে মা তুমি অবলে,” এই পদগুলি সর্ব্বদা উৎসাহের সহিত উচ্চৈস্বরে তাঁহাকে গাহিতে শুনা যাইত। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে শুনা গিয়াছিল, যে “আমার শেষ জীবনের দুইটি আশা সফল হইল না,—প্রথম আগ্রার যমুনার তীরে বসিয়া “নির্ম্মলসলিলে বহিছ সদা তট শালিনী সুন্দরী যমুনে ও” এই গানটি রচয়িতার স্বমুখে শুনিবার বাসনা এবং দ্বিতীয় জন্ম ভিটা বোড়াল গ্রামে শেষ মৃত্যু লাভ করা” এই দুইটি আশা আমার সফল হইল না।”

আজীবন কঠোর মানসিক পরিশ্রম শনৈঃ শনৈঃ তাঁহার জীবন ভিত্তী ভূমি ও জীবনীশক্তি হ্রাস করিয়া ফেলিতেছিল। অবশেষে ৭০ বৎসর বয়ক্রম কালে নিদারুণ পক্ষাঘাত রোগ, তাঁহার কার্য্যশীল জীবনগতি একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইবার পর, তিনি প্রায় আড়াই বৎসর কাল শয্যাগত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করেন। নিদারুণ রোগ যন্ত্রণায় শয্যাগত অবস্থার মধ্যেও তাঁহার চির প্রফুল্ল উৎসাহ দীপ্ত সৌম্য বদন একদিনের জন্যও অবসাদের মলিনতা প্রাপ্ত হয় নাই। শয্যাগত অবস্থায়ও সাক্ষাৎকারি জনগণের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহদীপ্ত আননে নানা বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত হইতেন। রুগ্নাবস্থায় অধিকাংশ সময় তিনি ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার শয্যাগত অবস্থার কালে তাঁহার একটি প্রিয়তম দৌহিত্রের মৃত্যু হয়। এই বালকটি তাঁহার এক বিধবা কন্যার পুত্র ছিল। তিনি এই বালকটিকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। রুগ্নাবস্থায় পাছে এই শোক সংবাদ তাঁহার পক্ষে ঘোর অনিষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়ায় এই

কারনে তাঁহাকে এই সংবাদ প্রথমে প্রদান করা হয় নাই। বালকটির মৃত্যু সংবাদ অনবগত হেতু তাহার মৃত্যুর কয়েক'দিন পরে যখন তিনি তাহাকে দেখিতে চাহিলেন, তখন এই নিদারুণ সংবাদ তাঁহার নিকট গোপন করিয়া রাখো আর অসম্ভব হইয়া উঠিল। চিকিৎসকেরা এই সংবাদ, তাঁহার রুগ্ন শরীরের পক্ষে কিরূপ সাংঘাতিক ফল উৎপাদন করিবে, সে বিষয়ে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে চিকিৎসকের পরামর্শে, যখন এ সংবাদ তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করা হইল, তখন তিনি শান্ত সমাহিত চিত্তে সাংসারিক দুঃখ শোকে উদাসীন প্রকৃত তাপসের ন্যায় এই নিদারুণ শোক সংবাদ শ্রবণ করিলেন। তাঁহার চির প্রফুল্ল সৌম্য বদন, মানসিক অধীরতার একটিও মাত্র সামান্য রেখা পতনেও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল না। তিনি মৃদু হাস্য পূর্ব্বক উপস্থিত লোক-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কেন যথা সময়ে আমাকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করা হয় নাই? অবিনাশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানে গমন করিয়াছে; তাহার জন্য কেন আমরা শোক করিব"। তৎপরে দৌহিত্রের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিবার পর, সমস্ত দিন শান্ত সমাহিত চিত্তে ঈশ্বর প্রার্থনায় নিযুক্ত থাকিয়া, সন্ধ্যাকালে বাটীস্থ সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,— "অবিনাশ তাহার সৌন্দর্য্য ও গুণের অনুরূপ স্থানে গমন করিয়াছে, তাহার জন্য কাহারো শোক করিবার আবশ্যক

নাই।” একমাত্র পুত্র-শোক-বিধুরা বিধবা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “সুকুমারী, তুমি যে এই নিদারুণ আঘাত এরূপ ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়া চলিতেছ, ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। ইহজীবন ও ইহ-জীবনের সুখ দুঃখ ক্ষণসূর্য্যালোক ব্যবধানকারি দ্রুত উড্ডিয়মান মেঘের ন্যায় যে ক্ষণস্থায়ি, এই তত্ত্বের সার মর্ম্ম যে তুমি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ, ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছি।” এই ঘটনার দেড় বৎসর পরে, আত্মীয়, বান্ধব, পুত্র কন্যা ও পরিবারবর্গের সেবা শুশ্রূষা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মানের সমাদরের মধ্যে ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

যে প্রতিভার প্রদীপ্ত প্রদীপ বঙ্গদেশকে আলোকিত করিবার জন্য প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহা শাশ্বত ধ্রুবলোকে পুনঃ মহোজ্জ্বলরূপে প্রজ্জ্বলিত হইবার জন্য অদৃশ্য হইল। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গদেশ গভীর শোক প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি আন্তরিক গভীর সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল।

গ্রাম্য উপাখ্যান।

সূচনা।

উনপঞ্চাশ পরগণার বাদলগ্রাম* একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। কায়স্থকৌস্তুভ-প্রণেতা রাজনারায়ণ মিত্র, যিনি কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ এই মত প্রথম উদ্ভাবন করেন, তিনি উক্ত গ্রন্থে বাদলগ্রামের প্রতি অচলা ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ঐ গ্রন্থে বলিয়াছেন যে বাদল গ্রাম অতি পুণ্যভূমি; সেখানে কোন ব্যক্তিকে বিসূচিকা ব্যাধিগ্রস্ত হইতে দেখা যায় না। তিনি বলেন বাদলগ্রামের ভূমি স্বর্ণভূমি, উহা যেমন উর্ব্বরা এমন আর কোন স্থান নহে। বাদলগ্রাম সেনবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে শ্রীমান সুযোগ্য সেনের (মিত্রজা মহাশয় শ্রীমান্ শব্দ ঐ রাজার নামের পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়াছেন) রাজধানী ছিল। এই রাজধানীতে তিনি একটী মহা-যজ্ঞ করেন। ইতিহাসে এই যজ্ঞের কথা উল্লিখিত আছে। বাদলগ্রাম যে উক্ত রাজার রাজধানী ছিল তাহার অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ মিত্র মহাশয় বলেন যে যখন বন কাটিয়া ঐ গ্রামের পুনরায় নূতন পত্তন হয় তখন

---

* বোড়াল গ্রাম।

যে স্থান এক্ষণে দিঘির আড়া বলিয়া আখ্যাত এবং যাহা এক বিস্তীর্ণ সরোবরের উপকূল সেই দিঘির আড়ায় রাশীকৃত ভস্মীভূত বিল্বপত্র পাওয়া গিয়াছিল। গ্রামের ঘোষবংশীয়দিগের আদি পুরুষ জঙ্গল কাটিয়া যখন পুনরায় ঐ গ্রামের পত্তন করেন তখন সেই জঙ্গলের মধ্যে একঘর মানুষ পাওয়া যায়। তাহারা বাদলগ্রামের সরকার বংশ। এই সরকারবংশীয় লোকেরা দূরস্থ অন্য গ্রাম হইতে তাহাদের আহার-দ্রব্য আহরণ করিয়া ঐ বনেতেই বাস করিত। পুনঃপত্তনের পর গ্রামটি ক্রমে ক্রমে অতি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আসিয়া তথায় বসতি করিল। তাহাদের বাসস্থান হওয়াতে উহা ক্রমে সমাজ স্থান বলিয়া গণ্য হইল। যে গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণ বসতি করে তাহা সমাজ স্থান পদবীতে আরোহণ করে। এক সময়ে বাদলগ্রাম নিত্য উৎসব ও আনন্দের স্থান ছিল; এক্ষণে উহা মেলেরিয়া প্রপীড়িত এবং নিরানন্দ ও বিষাদের আলয়। এক্ষণে উহা ক্রমে পুনরায় জঙ্গলে পরিণত হইতেছে। এত জঙ্গল বৃদ্ধি হইয়াছে যে বহুসংখ্যক বন্যশূকর তন্মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে এবং শকুনি সকল নারিকেল বৃক্ষোপরি তাহাদের নীড় নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে। গ্রামে দুপুর বেলা অন্ধকার কুপ কুপ করিতেছে; কত বাস্তুভূমি যে জনশূন্য হইয়াছে তাহা বলা যায় না। আমরা বাল্যকালে উহাকে হৃষ্ট পুষ্ট জন পূর্ণ এবং নিত্য উৎসব ও আনন্দযুক্ত

দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে সেরূপ নাই। এক্ষণে বাদল গ্রামে যে কয় জন লোক আছেন তাঁহারা মেলেরিয়া প্রপীড়িত এবং তাঁহাদের শরীর কঙ্কালাবশিষ্ট ; আবার সেই সকল কঙ্কালাবশিষ্ট লোক দিবারাত্রি উপজীবিকা চিন্তায় জর্জ্জরিত। আমাদের বাল্যকালে প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরা এক একটী পাগড়ি মাথায় বাঁধিয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে শপে বসিয়া যেরূপ গল্প করিতেন, বাদল গ্রামে সেরূপ দৃশ্য এক্ষণে আর দেখা যায় না। পূর্ব্বে জিনিস পত্র অল্প-মূল্য ছিল, তজ্জন্য লোকের এত উদ্বেগ ছিল না। আমরা শুনিয়াছি পূর্ব্বে জামাই বাটী আসিলে লোকে এক পণ কড়ি লইয়া বাজার করিতে যাইত, তাহাতেই কুলান হইত। এক্ষণে স্বাধীন বাণিজ্যের উৎপাতে দ্রব্যাদি সেরূপ অল্প-মূল্য নাই, তাহার উপর আবার মেলেরিয়ার উৎপাত ; আর কি রক্ষা আছে? হে বাদল! তোমার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দর্শন করিলে চক্ষে জল আইসে। আহা! কোথায় সে আনন্দোৎসব? কোথায় সে আমোদ প্রমোদ! কোথায় সে বালকদিগের ক্রীড়া কৌতুক! সকলই স্বপ্নের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

আমরা প্রস্তাবান্তরে প্রথমে বাদলগ্রামের ভৌগোলিক বিবরণ দিয়া সে কালের কথা স্মরণ পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে ঐ গ্রাম-বাসী মনুষ্যের এক একটী চিত্র পাঠকবর্গকে উপহার দিবার মানস করি।

বাদল গ্রামের ভৌগোলিক বিবরণ।

কোন বিখ্যাত শিক্ষক বলিয়াছেন যে বালকদিগকে প্রথম ভূগোল এই প্রকারে শিক্ষা দেওয়া উচিত; প্রথমে যে গ্রামে সে বসতি করে সেই গ্রামের চতুঃসীমা, তৎপরে যে জেলায় সে গ্রাম সংস্থিত, তৎপরে যে প্রদেশে ঐ জেলা অবস্থিত, তৎপরে যে দেশে ঐ প্রদেশ অবস্থিত, তৎপরে যে মহাদেশে ঐ দেশ অবস্থিত তাহার, এবং তৎপরে সাধারণতঃ পৃথিবীর ভৌগোলিক বিবরণ, তৎপরে সৌরজগতের বিবরণ, এবং সর্ব্বশেষে সমস্ত বিশ্বের সাধারণ বিবরণ শিখান কর্ত্তব্য। এইরূপে বালকের ভৌগোলিক বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে বিকশিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যদ্যপিও উক্ত শিক্ষক বালকের ভৌগোলিক বুদ্ধি বিকশিত করিবার চোটে (যেমন আমরা বলিয়া থাকি মুখস্থ চোটাৎ কিম্বা কলমস্থ চোটাৎ) ভূগোলের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন তথাপি বালককে ভূগোল শিক্ষা দিবার বিষয়ে অনেক পরিমাণে তাঁহার উপদেশ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। আমরা বাল্যকালে এই প্রণালী অনুসারে ভূগোল বিদ্যায় শিক্ষিত হই নাই, কিন্তু শিক্ষকের বিনা উপদেশে আমরা আপনা হইতেই ঐ প্রণালী কিয়ৎ পরিমাণে অনুসরণ করিয়াছিলাম। আমরা ভূগোল শিখিবার প্রথম অবস্থায় আমাদিগের নিজ গ্রামের অর্থাৎ বাদল গ্রামের চতুঃসীমা জানিতে বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছিলাম।

পাঠকবর্গকে আমরা উহার চতুঃসীমার বিবরণ দিবার সময় কিয়ংপরিমাণে ছেঁদো কথা ব্যবহার করিব। সভ্যতার প্রধান লক্ষণ ছেঁদো কথা ব্যবহার করা। বিখ্যাত ফরাসীস রাজনীতিজ্ঞ টেলি রাঁ (ফরাসীস্ ভাষায় চন্দ্রবিন্দুর ছড়াছড়ি) বলিয়াছেন যে আমাদের মনের ভাব গোপন করিবার জন্যেই ভাষা সৃষ্ট হইয়াছে। তবে বঙ্গদেশ এখনও সম্পূর্ণ-রূপে সভ্য হয় নাই, অর্দ্ধসভ্য হইয়াছে; অতএব আমরা বাদল গ্রামের চতুঃসীমার বিবরণ অর্দ্ধেক ছেঁদো কথায় এবং অর্দ্ধেক সাদা কথায় দিব। বাদল গ্রামের পূর্ব্ব-পশ্চিম সীমা ছেঁদো কথায় এবং উত্তর দক্ষিণ সীমা সাদা কথায় বলিব। বাদল গ্রামের পশ্চিম দিকে সঙ্গীত-নায়ক রাজশ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাহুলীন যন্ত্র অপর ভাষায় যে নাম দ্বারা প্রকাশ হয় সেই নামের গ্রাম। উহার পূর্ব্ব দিকে গড়াই গ্রাম। পাঠকবর্গ মনে করিবেন না যে ঐ স্থানটী গড়ানে বলিয়া ঐ গ্রামের নাম গড়াই হইয়াছে। ছেঁদো কথার প্রণালী অনুসারে উহা গড়াই শব্দে আমরা নির্দ্দেশ করিলাম। বাদলগ্রামের উত্তরে ব্রহ্মপুর ও কামডৌরি গ্রাম কায়স্থ-কৌস্তুভ-প্রণেতা রাজনারায়ণ মিত্র যিনি এমন পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী ছিলেন যে তাঁহার নিকট আমাদিগের বান্ধববর শ্রীমান্ রাজেন্দ্রলাল মিত্র (আমরা লোককে উপাধি প্রদানে প্রথমোক্ত মিত্র মহাশয়ের প্রণালী অনুসরণ করিয়া থাকি।) কোথায় আছেন! তিনি এই কথা

বলেন যে কামডৌরি গ্রামে বিখ্যাত সেনবংশীয় রাজা শ্রীমান্ সুযোগ্য সেনের কামোদ্রেক নামক রমণীয় উদ্যান ছিল। তাহাতেই কামডৌরী নাম হইয়াছে। বাদলগ্রামের দক্ষিণ দিকে নোনা ও বনহুগলী গ্রাম। পাঠকবর্গ নোনা গ্রাম নাম শুনিলেই ঐ নাম আতার মাসতুত ভাই নোনার নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এমত অবশ্যই নির্দ্দেশ করিবেন। কিন্তু বনহুগলী নামের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল তাহা আমরা এপর্য্যন্ত অবধারণ করিতে সক্ষম হই নাই। হুগলী সহরে বন নাই, বনহুগলী বনাকীর্ণ স্থান এই জন্য বনহুগলী নাম হইয়াছে, কি অন্য কারণে হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। এবিষয় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের একটী মহাসভা হওয়া কর্ত্তব্য। বাদল গ্রামের উত্তর সীমায় দিঘি নামক প্রকাণ্ড সরোবর সংস্থিত। বাদল গ্রামে যদিও অন্যান্য দিঘি আছে, যথা রায় দিঘি, কিন্তু এই দিঘিটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া কেবল দিঘি নামে খ্যাত, যেমন ইংরাজীতে বলে "The দিঘি"। এই দিঘি এক্ষণে অনেকটা মজিয়া গিয়াছে। আমাদিগের স্মরণ হয় আমা-দিগের বাল্যকালে উহা অসংখ্য শতদল-শোভিত অতি বিস্তীর্ণ সরোবর ছিল। মধ্যস্থানে খানিকটা জায়গায় পদ্ম দেখা যাইত না। জলের গভীরতা জন্য তৎস্থানে পদ্ম জন্মিত না। লোকে বলে যে ঐ স্থানে জলের নিম্নে

একটী মন্দির আছে। দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় পাড়ার কতিপয় বালককে টটাটিটি ইংরাজী শিখাইবার জন্য স্কুল-মাষ্টার নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি যেমন স্কুলমাষ্টার ছিলেন তেমনি জেলেও ছিলেন। মাছ ধরিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। তিনি এই দুই পরস্পর অসম বৃত্তি আপনাতে সংযোগ করিয়াছিলেন। ইনি একবার আমা-দিগকে বলিয়াছিলেন যে তিনি একবার ডোঙ্গা করিয়া ঐ দিঘির মধ্যস্থানে কেঁচা দিয়া যেমন মাছ বিদ্ধ করিতে যাইবেন অমনি কেঁচার অগ্রভাগ সেই মন্দিরের ছাদের উপর ঠন্ করিয়া লাগিয়াছিল। ঐ দিঘির এক দিকের উপকূলে জঙ্গল মধ্যে ত্রিপুরা সুন্দরীর মঠ নামে একটী মন্দির ছিল। এক্ষণে তাহার ভগ্নাবশেষ অতি অল্পই আছে। দিঘির উত্তরে একটী নীলকুঠি ছিল। এই নীল-কুঠির সাহেবের সহিত বাদলগ্রামের লোকের একবার বিবাদ হয় তাহাতে নীলকুঠির সাহেব অশ্বারূঢ় হইয়া নিজ সৈন্য সামন্ত লইয়া বাদল গ্রাম আক্রমণ করেন, তাহাতে বাদল গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে উত্তম মধ্যম দেয়। মার খাইয়া সাহেবের পো ভূমিসাৎ হয়েন এবং তাঁহার নাক দিয়া ভল ভল করিয়া রক্ত বাহির হয়। আমাদিগের যৌবনকালে হেনসন্ নামে এক সাহেব এই কুঠির কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সহিত এক দিন কথোপকথনের সময় ইংলণ্ডের লর্ডদিগের কথা উঠিলে তিনি বলিলেন "The Lords of England

are bloody cut-throats" অর্থাৎ ইংলণ্ডের লর্ডেরা ভয়ানক নর-হন্তা। ইহাতে ইংলণ্ডের জমীদার ও প্রজার মধ্যে কি সদ্ভাব তাহা বিলক্ষণ অনুভব করা যাইতেছে। নীলের কারখানায় লোকসান হওয়াতে নীলকুঠির মালিক নীলকুঠি পরিত্যাগ করেন। এই নীলকুঠি পরিত্যক্ত হইলে সন্ধ্যার সময় তাহার ছাদের উপর বসিয়া আমরা পদ্মসুরভি-সংযুক্তা সন্ধ্যার দক্ষিণ বায়ু সেবন করিতাম। ঐ পদ্মবন মধ্যে অনেক বিগ্‌ড়ি হাঁস সঞ্চরণ করিত। ঐ হাঁস মারিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আমাদিগের বন্দুক ছুঁড়ার সংকল্প হইত, কিন্তু বাঙ্গালী ছেলের শূরত্বসূচক সকল সংকল্পের ন্যায় তাহা কখন কার্য্যে পরিণত হয় নাই। গ্রামের মধ্যস্থলে ধ পুকুর নামে পুষ্করিণী আছে। "ধ পুকুর" শব্দ ধোবা পুষ্করিণীর সংক্ষেপ। গ্রামের অধিকাংশ লোকে অদ্যাপি তাহার জল ব্যবহার করে। ঐ পুষ্করিণীর উপকূল গ্রামের একটী বিখ্যাত স্থান, যে হেতু তথায় দু একটী গুরুতর ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত-লেখকেরা সেই সকল ঘটনা পুরাবৃত্তে তুলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল ঘটনা এমনি গুরুতর যে পুরাবৃত্তে উঠা কর্ত্তব্য। প্রথম ঘটনাটী এই; নিকটস্থ গ্রাম হইতে আগত একবার কোন বরযাত্রীর দলের লোকের সহিত গ্রামভাটী লইয়া বাদল গ্রামের লোকের এরূপ বচসা উপস্থিত হইয়াছিল যে তাহারা তাহাদিগকে মারিয়া বেদম্ করিয়াছিল

এবং বরের পালকী ভাঙ্গিয়া পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিয়াছিল। বরকে পদব্রজে ভাবী শ্বশুরালয়ে যাইতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় ঘটনাটী এই;—গ্রামের নাগবংশীয় কোন মহাত্মা ব্যক্তির ধোবা পুষ্করিণীর তীরবাসী কোন ধোবার স্ত্রীর সহিত প্রসক্তি হওয়াতে ধোবার পাটের উপরে তাহাকে ফেলিয়া পাটে যেরূপ কাপড় আচড়ায় কুপিত স্বামী সেইরূপ তাহার শরীরের উপর কাপড় আচড়াইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। ধোবা পুষ্করিণীর কিছু দক্ষিণে সরল নামে একটী বৃহৎ সরোবর আছে। সর শব্দে পুষ্করিণী বুঝায়। এই শব্দ হইতে, কিম্বা পুষ্করিণীটী সরল চতুষ্কোণাকৃতি এই জন্য উহার নাম সরল হইয়াছে কিনা তাহা পুরাতত্ত্ব-বিশারদ পণ্ডিতদিগের বিচারার্থ অর্পিত হইল। এই সরল পুষ্করিণীর উপকূলস্থ বনের ভিতর ককাইচণ্ডী নাম্নী দেবীর ক্ষুদ্র মন্দির আছে। দেবীর নাম ককাইচণ্ডী, তাহার কারণ এই যে তিনি সর্ব্বদা ককিয়া আছেন, অর্থাৎ জিব বাহির করিয়া আছেন। গ্রামের কোন ব্যক্তিকে কোন কারণ বশতঃ এক দিন দুপুর রাত্রে ঐ বনমধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছিল। তৎপর দিন তিনি বলিলেন যে, তিনি উহার মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে দেখিলেন যে, ককাইচণ্ডীর স্বামী মহাজটাজুটসমন্বিত কালভৈরব দুইটা জ্বলন্ত লৌহদণ্ড পরস্পর প্রতিঘাত করিয়া সহস্র সহস্র মহাস্ফুলিঙ্গ বাহির করিয়া বন আলোকিত করিতেছেন।

ইউক্লিডের জ্যামিতির তত্ত্বে আমাদের যেরূপ ধ্রুব বিশ্বাস, আমরা তখন তাঁহার ঐ কথায় সেইরূপ বিশ্বাস করিয়াছিলাম।

উপরে আমরা বাদল গ্রামের যে চতুঃসীমা এবং উহার অভ্যন্তরস্থ যে সকল স্থান বর্ণন করিলাম, সেই চতুঃসীমার মধ্যে সেই সকল স্থানে বাল্যকালে আমরা কি আনন্দের সহিত সঞ্চরণ করিতাম। যে কালে কলার ছটায় শামুকের শাঁস বাঁধিয়া পুকুরে ফেলিয়া রামের পিতা দশরথ ধরিতাম এবং বাকসফুলের মধু পান করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতাম তখন কি মনোহর কাল ছিল। সে কালে সকল বস্তু কি মনোহর বোধ হইত।

Oh ! would I were a boy again
  When life seemed formed of sunny years
And all the heart then know of pain
  Was wept away in transient tears.

A time when meadow, grove and stream
  The earth and every common sight
      To me did seem
  Apparelled in celestial light
  The glory and freshness of a dream.

বালক হইতে পুনঃ চায় মোর মন
  হর্ষদীপ্ত বর্ষময় যবে দেখাইত
মানবায়ু ; যাহা কিছু হৃদয়-বেদন
  বারেক অশ্রুবর্ষণে ধুইয়া যাইত।

যখন স্বর্গীয় জ্যোতিঃ পরিধান করি
সুস্বপ্নের নবীনতা ও দীপ্তি ধরি
ভাতিত প্রান্তর, কুঞ্জ, সামান্য তটিনী,
যৎসামান্য দৃশ্য আর সামান্য মেদিনী।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, যে এই কালে দশরথ ধরা ও বাকস পুষ্পের মধু পান করা প্রধান আমোদ ছিল। এতদ্ব্যতীত মাছ ধরা, ভিন্ন ভিন্ন উদ্যান হইতে কাঁচা আঁব সংগ্রহ করা এবং কড়াই সুঁটি-ক্ষেতে পড়িয়া কড়াই সুঁটি খাওয়া, এইরূপ আরও কয়েকটী আমোদ ছিল। মাছ ধরিবার জন্য আমরা কি আগ্রহের সহিত চার ও মসলা তৈয়ারি করিতাম এবং যখন মাছে ছিপের ফাতনা একবার ডুবাইত একবার উঠাইত তখন আমাদিগের স্পন্দমান হৃদয়ে কি উল্লাস উপস্থিত হইত। তাহার পর মৎস্য খেলান কি উল্লাসজনক তাহা বর্ণনা করা যায় না। যে সকল উদ্যান হইতে কাঁচা আঁব কিম্বা অন্য ফল সংগ্রহ করিতাম সে সকল উদ্যানের রক্ষকেরা আমাদিগকে বড় কিছু বলিতেন না। যে সকল কড়াই সুঁটির ক্ষেতে পড়িয়া আমরা কড়াই সুঁটি খাইতাম সে সকল ক্ষেতের কৃষকেরাও বড় কিছু বলিত না। কিন্তু উহার মধ্যে এক জন দুষ্ট কৃষক একবার "কেও" বলিয়া তেড়ে আসাতে আমাদিগেয় দলস্থ যণ্ডামার্ক বীর বালকেরা কড়াই সুঁটি লইয়া অনায়াসে চম্পট্‌ দিল, কিন্তু মাঝের পাড়ার

বোসেদের বাটীর একটী বালক, যিনি স্কুল ছাড়িয়া সবে কলেজে ঢুকিয়াছেন এবং যিনি আমাদিগের মধ্যে অতি ধীর ও বিদ্বান বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তিনিই কেবল ধরা পড়িলেন। কথাই আছে "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।" ফলের প্রতি বালকের লোভ চিরকাল প্রসিদ্ধই আছে। নরকুল যে বানরকুলসম্ভূত তাহার প্রমাণ সকলের মধ্যে এই সর্ব্বপেক্ষা বিশিষ্ট প্রমাণটী ডারউইন সাহেব তাঁহার গ্রন্থে দেন নাই কেন আমরা বলিতে পারি না। সকল দেশের বালকেরাই উদ্যান লুণ্ঠনকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। সকল দেশের বালকদের একই প্রকার স্বভাব।

"Boys are boys all the world over"

আমাদের শাস্ত্রে একটী শ্লোক আছে তাহাতে শস্যের হানিকর ছয় প্রকার পদার্থের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে গঙ্গাপাল, মুষিক ও পক্ষীর উল্লেখ আছে। এই ছয় প্রকার পদার্থকে "ঈতি" বলে। কিন্তু বালকেরা প্রধান "ঈতি"; শ্লোক রচয়িতা কেন যে তাহাদিগকে নিজ শ্লোকে উল্লেখ করেন নাই আমরা বলিতে পারি না। তাহারাও "মুষিকাখগাঃর" মধ্যে। যখন এক ঝাঁক বালককে আমাদিগের উদ্যান আক্রমণ করিতে আসিতে দেখিতে পাই তখন আমরা বাটীর পরিজনকে বলি "মুষিকাখগাঃ" আসিতেছে হে, সাবধান। কেবল বালকেরা যে এ বিষয়ে দোষী এমন নহে, কোন কোন প্রৌঢ়কেও

এবিষয়ে দোষী হইতে দেখা গিয়াছে। কবি Dryden বলেন

"Men are but children of larger growth"

"প্রৌঢ় বৰ্দ্ধিত বালক মাত্র।" আমরা জানি কোন বিভাগের কমিসনার সাহেব একবার মফঃস্বলে গস্তের সময় কোন কড়াই সুঁটি ক্ষেতে পড়িয়া কড়াই সুঁটি খাইতে দৃষ্ট হইয়াছিলেন। ক্ষেত্র স্বামী কৃষক তাঁহার এই আচরণের বিপক্ষে বলাতে সাহেব তাহাকে কড়াই সুঁটির খোসা ফেলিয়া মারিতে লাগিলেন। কমিসনার সাহেব কৃষককে কড়াই সুটীর খোসা ছুড়িয়া মারিতেছেন ইহার একটী উত্তম ছবি হইতে পারে।

আমরা পরে বাদল গ্রামের এক একটী ব্যক্তির নক্‌সা পাঠকবর্গকে উপহার দিব। আমরা যাহা বলিব তাহা কিছুমাত্র অলীক নহে সকলই সত্য। কেবল কোন কারণ বশতঃ কোন কোন ব্যক্তির নামের কিঞ্চিৎ রূপান্তর করিয়া দিব। আমরা যে সকল ঘটনার বিবরণ দিব, তাহা চল্লিশ বৎসর অথবা তদধিক কাল পূৰ্ব্বে ঘটিয়া গিয়াছে।

আমাদিগের কোন বন্ধু ইংরাজী Spiritualist শব্দ বাঙ্গালা "আত্মাওয়ালা" শব্দ দ্বারা অনুবাদ করেন। আমরা আত্মওয়ালাদিগের মধ্যে এক জন প্রধান। আমরা ভূত নামাইতে পারি। আপাততঃ পাঠকবর্গের সম্মুখে বাদল গ্রামের পূৰ্ব্বনিবাসীদিগের এক একটী প্রেতাত্মা নামাইয়া তাহার পরিচয় দিয়া তাহাকে বিদায় দিব।

"Come like shadows so depart."

"ছায়া সম এস ছায়া সম যাও"

দয়ারাম বসু।

দয়ারামবসু ও তাঁহার ছয় ভাই দেওয়ান ছিলেন। সেকালের কলেক্টর ও মেজিষ্ট্রেটের সেরাস্তাদারকে লোকে দেওয়ান বলিত। সেকালে উৎকোচ গ্রহণের বিলক্ষণ প্রবলতা ছিল। তখন ইংরাজী আমলের প্রথম অবস্থা। যাহারা দেওয়ানী করিতেন তাঁহারা বিলক্ষণ এক হাত মারিতেন। তাঁহাদের সকল আয়ই যে উৎকোচমূলক এমন নহে। কিছুকালের পূর্ব্বের আদালতের নাজীরের মিরনের ন্যায় উক্ত দেওয়ানদিগের সরকারের জানত কতকগুলি ন্যায্য আয় ছিল। সাত ভাই এক কালে দেওয়ান, সামান্য কথা নহে। মনে কর একটা অতি প্রকাণ্ড বাটীর সাত মহলের প্রত্যেক মহলে পূজার সময় পূজার ধূম লাগিয়াছে। কি জমকাল ব্যাপার! আমরা ছেলেবেলা ইহাদিগের বংশ দুরবস্থাপন্ন দেখিয়াছি। আমাদিগের বাল্যকালে এই বংশের নয়ান চাঁদ বসু নামে এক ব্যক্তি কলিকাতায় কেরাণী গিরি কর্ম্ম করিতেন। বাদল গ্রাম কলিকাতার অতি নিকট। নয়ান বসুর ইংরাজী হস্তাক্ষর অতি উত্তম ছিল। এখন বাজারে যেরূপ কপি শ্লিপস্ (Copy slips) বিক্রয় হয়, সেকালে সেরূপ বিক্রীত হইত না। সেকালে যিনি হস্তাক্ষর ভাল লিখিতে পারিতেন

তাঁহার নিকট হইতে লোকে কপি শ্লিপস লিখাইয়া লইয়া তাহা দেখিয়া ইংরাজী লেখা অভ্যাস করিত। যাহারা এইরূপ কপি শ্লিপস্ বিতরণ করিতেন তাঁহারা যে কত সম্মান ও আদরের পাত্র ছিলেন তাহা বলা যায় না। আমরা বাল্যকালে নয়ান চাঁদ বসুর নিকট হইতে ইংরাজী কপি শ্লিপ্‌স লিখাইয়া আনিয়া ইংরাজী লেখা অভ্যাস করিয়াছি। আমাদিগের স্মরণ হয় আমাদিগের বাল্যকালে আমাদিগের বাটীর আটচালায় ইংরাজী লিখিবার আড্ডা ছিল। তথায় সারি সারি ছোট ছোট রাইটিং ডেস্ক ছিল। পাড়ার ছেলেরা সেই সকল ডেস্কের সম্মুখে বসিয়া ইংরাজী লিখিত। কোন বালক কোন দিন অনুপস্থিত থাকিলে তাহার শাস্তি স্বরূপ তাহার সঙ্গীরা তাহার ডেস্ক লইয়া গাছে ঝুলাইয়া রাখিত। তাহার পর দিন তাহাকে তাহা গাছ হইতে নিজে পাড়িয়া আনিতে হইত। দয়ারাম বসুর বংশোদ্ভব ব্যক্তি কেরাণীগিরি করিবেন ইহা অসম্ভব। কোথায় সাত ভাই দেওয়ান, কোথায় মাথায় ফ্যাটা বাঁধিয়া আফিস মাষ্টার সাহেবের লাথি খাওয়া। পৃথিবীর গতিকই এইরূপ!

নরনারায়ণ ঘোষ।

নরনারায়ণ ঘোষের পিতা ঢাকার দেওয়ান ছিলেন। তাহার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিবনারায়ণ ঘোষ দেওয়ান হয়েন। হাইদ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রীর পদ যেমন বংশ-

পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে তেমনি বঙ্গদেশের উক্ত ক্ষুদ্র দেওয়ানি পদও বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিত। এই প্রথার জের এমন কি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল পর্য্যন্ত টানিয়াছিল। অনেকে অবগত আছেন বাবু রামকমল সেনের মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে তাঁহার তিন পুত্র হরিবাবু প্যারীবাবু ও বংশী বাবু টেঁকশালের দেওয়ান হইয়া ছিলেন। বংশী বাবুর পর হরি বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু বাবু দেওয়ান হন। যদু বাবু জয়পুরে যাত্রা করিলে পরিশেষে বিখ্যাত কেশব বাবু পর্য্যন্ত কিছুদিন উক্ত দেওয়ানি কর্ম্ম করেন। শিবনারায়ণ ঘোষের সতের বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি সেই বয়সে হাতের বালা ও কাণের মাকড়ি খুলিয়া দেওয়ানী করিতে যান। ঢাকা নগরে তাঁহার বাসাবাটিতে তিনি একটী অতি বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। প্রতিদিন আহারের সময় সেই ঘণ্টার বিশাল রব শুনিয়া ঢাকার বাসাড়ে ভদ্রলোক তাঁহার বাটী আসিয়া আহার করিত। প্রতিদিন প্রায় তিন চারি শত পাত পড়িত। নরনারায়ণ ঘোষ নিজে দেওয়ানি করেন নাই। তিনি বাদল গ্রামে থাকিয়া বাটীর কাজ দেখিতেন। সেকালে বড় ভাই কাজ কর্ম্ম করিতেন, ও ছোট ভাই বাটীতে থাকিয়া বাটীর তত্ত্বাবধান করিতেন, এইরূপ প্রথা ছিল। এখনও পল্লীগ্রামের অনেক স্থানে এইরূপ প্রথা আছে। সেকালে কলিকাতায় মিউনিসিপাল

সুরতি (Municipal Lottery) হইত। এখন যেমন মিউনিসিপাল কর বসাইয়া নগরের শোভাবর্দ্ধন করা হয় তখন ঐ কার্য্য ঐ সুরতির টাকা দ্বারা সম্পাদিত হইত। নরনারায়ণ ঘোষের নামে এইরূপ সুরতিতে একবার লক্ষ টাকার প্রাইজ উঠে। আমরা শুনিয়াছি কেহ এইরূপ লক্ষ টাকা প্রাইজ পাইবার সংবাদ পাইয়া আহ্লাদে মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু নরনারায়ণ ঘোষ মরেন নাই, কারণ তিনি সম্পদে অভ্যস্ত ছিলেন। নরনারায়ণ বড় বাবু ছিলেন। তিনি একবার বাবলগ্রামে আপনার বাটিতে মজলিস্ করিয়া তাহাতে কলিকাতার বড়মানুষদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই মজলিস্ উপলক্ষে নরনারায়ণ স্বীয় বাটীর সিঁড়ির ধাপগুলি শাল দিয়া মুড়িয়া দিয়াছিলেন। আমরা বাল্যকালে নরনারায়ণ ঘোষকে দেখি নাই, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধানাথ ঘোষকে দেখিয়াছি। রাধানাথ ঘোষজা মহাশয় তাঁহার পিতার বিষয় অপরিমিত ব্যয় দ্বারা উড়াইয়া দিয়াছিলেন। ইনি আফিঙ সেবন করিতেন এবং উত্তম সেতার বাজাইতে পারিতেন। ইনি অতি অমায়িক লোক ছিলেন। তাঁহার এক রোগ ছিল। আহারের সময় তিনি ক্রমাগত ভাত বাছিতেন, তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "আপনি ক্রমিকই বাছিবেন ত খাবেন কখন?" আমরা সেইরূপ এক্ষণকার সমালোচক মহাশয়-দিগকে বলিতে পারি "আপনারা ক্রমিক বাছিবেন ত

খাবেন কখন, কেবল যদি কবিতার দোষ গুণ বাছিবেন তবে কবিতা উপভোগ করিবেন কখন।” যেমন রামধনুর কেবল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করিলে রামধনুর সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায় না, তেমনি বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে কবিতার কেবল দোষগুণ বিচার করিলে কবিতা উপভোগ করা যায় না। রাধানাথ বাবু অহিফেন সেবন নিবন্ধন অতি দীর্ঘসূত্রী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিবার মানসে বাটী হইতে বাহির হইতেন, বাহির হইয়া পাড়ার হরিহর বসুর বাটী আসিয়া যেরূপ গল্প আরম্ভ করিতেন তাহাতে কলিকাতায় আর যাওয়া হইত না। এইরূপ ক্রমাগত প্রত্যহ কিছু দিন করিয়া পরিশেষে কলিকাতা যাওয়ার ইচ্ছা ছাড়িয়া দিতেন। আমরা গরীব রাধানাথ বাবুর দোষ দি কেন, অনেকেই সেক্সপিয়ারের হেম্‌লেটের ন্যায় সংকল্প সাধন করেন, করেন কিন্তু হইয়া উঠে না। তাঁহাদিগের আর কলিকাতায় কখন যাওয়া হয় না। রাধানাথ বাবুর বাটী “বাবুর বাটী” বলিয়া গ্রামে প্রখ্যাত ছিল। পূজার সময় তাঁহার বাটীতে যখন প্রতিমা নির্ম্মাণ হইত তখন আমরা কি ঔৎসুক্যের সহিত সেই প্রতিমা নির্ম্মাণ দেখিতাম! দেবমূর্ত্তির মনোহর বিকাশক্রম দেখিতাম। কাটমা, একমেটে, দোমেটে, রং, পরিশেষে চালচিত্র। গ্রন্থ রচনা-তেও এইরূপ কাটমা, একমেটে, দোমেটে, রং, ও তৎপরে

চিত্র আছে। এই কয়েকটী ব্যাপারের মধ্যে যিনি একটী রহিত করেন তাঁহার গ্রন্থ ভাল হয়না। গোষ্ঠবিহারের দিন গ্রামে জমীদারদিগের বাটীতে যাঁহারা সং সাজিতেন তাঁহারা সং সাজিয়া বাবুদের বাটীর সম্মুখের মাঠে উপস্থিত হইতেন। এই উপলক্ষে বিশেষ জনতা হইত। একবার ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ রামধন বৈদিক মহাশয় যিনি গড়াই গ্রামে কালীবাটী স্থাপন করিয়া উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন তিনি গোষ্ঠ-বিহারে তিন চারি বৎসরের শিশুর মত কোমর পাটা কোমরে পরিধান করিয়া সন্দেস খাইতেছেন এইরূপ সাজিয়া-ছিলেন। কালীপদ দে নামক এক অতি সুন্দর বালক এমনি সখী সাজিয়া ছিল যে লোকে আশ্চর্য্য ও মোহিত হইয়াছিল। যখন তাহার বিষয় জল্পনা হইতেছিল তখন আমরা আমাদিগের কালেজী বিদ্যা ফলাইলাম। আমরা বলিলাম যে তাহার "কালী" নাম সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন নহে; গ্রীক ভাষার ক্যালন (*Kalon*) শব্দ হইতে উৎপন্ন। গ্রীক ভাষায় ক্যালন শব্দে সুন্দর বুঝায়। সেই বাবুদের বাটী এক্ষণে পতিতাবস্থায়। যেখানে এরূপ আনন্দ উৎসব হইত সেই স্থান এক্ষণে নির্জ্জন, নিরানন্দ ও নিরুৎসব। পৃথিবীর সকলই অস্থায়ী!

তারাচাঁদ ঘোষ।

বাদল গ্রামে নারায়ণ ঘোষের বংশের পরেই জমীদার ঘোষেরা প্রসিদ্ধ। এই বংশে তারাচাঁদ ঘোষ ও হরচন্দ্র ঘোষ

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা গ্রামে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কোন অসাধারণ সৎকর্ম্ম ও করেন নাই, কোন অসাধারণ দুষ্কর্ম্ম ও করেন নাই। সচরাচর ভদ্রলোকে যেমন জন্মে, বাঁচে ও মরে সেইরূপ তাঁহারা জন্মিয়াছিলেন, বাঁচিয়াছিলেন ও মরিয়াছিলেন। ইংরাজী কবি কনিংহ্যাম (Cunningham) জনৈক মনুষ্যের জীবন বৃত্তান্ত নিম্নোদ্ধৃত সংক্ষেপ পদ্যে লিখিয়াছিলেন ;—

"That he was born it can not be denied.
Ate, drank and slept, talked politics
and died."

তিনি এ সুখ দুঃখময় অবনিমণ্ডলে জন্মিয়া
ছিলেন কে না মানিবে ?
তিনি খাইয়া, পিইয়া, শুইয়া, রাজা উজির
মারিয়া মরিলেন, কে না মানিবে ?

তারাচাঁদ ঘোষের দুই পুত্র, লোকনাথ ঘোষ ও দীননাথ ঘোষ। লোকনাথ ঘোষ বিদ্বান্ সচ্চরিত্র ও উপার্জ্জনশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন। লোকে বলে, "মুগে শীঘ্র পোকা ধরে।" কোন আরব্য কবি বলিয়াছেন, "মনুষ্য মরিবার সময় শমন তাহাদিগের নামের ফর্দ্দ দেখেন এবং তাহাদিগের মধ্যে যাহারা রত্ন বিশেষ আপনার ভাণ্ডারের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহাদিগকে অগ্রে টানিয়া লয়েন।" দীননাথ ঘোষ অনেক দিন মথুরার

সরকারী ডাক্তারী কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঐ পদে অভিষিক্ত ছিলেন। ঐ বিদ্রোহের সময় তিনি আমাদিগকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই কথাগুলি ছিল, "আমি পত্র লিখিতে লিখিতে শুনিতেছি যে সিপাহীরা আসিয়া সাহেবদিগকে মারিয়া ফেলিয়া বাজার লুটপাট আরম্ভ করিয়াছে। আমার যে কি ভয় হইতেছে তাহা লিখিতে পারি না।" এই পত্র আমরা ছয় মাস পরে প্রাপ্ত হই। এই পত্র যে কত জায়গায় ঘুরিয়াছিল কত জায়গায় আটকিয়া ছিল তাহা বলা যায় না। তৎপরে আমাদের হাতে আসিয়া পড়িল। এমন কাষ্ঠ-প্রাণ পত্র আমরা কখন দেখি নাই। তাহা কোন মিউজিয়মে অর্পণ করিব বলিয়া আমরা রাখিয়া দিয়াছি।

শিবচন্দ্র ঘোষ।

শিবচন্দ্র ঘোষ বাদল গ্রামের জমীদার ঘোষ বংশের অন্যতর ব্যক্তি। তিনি উক্ত গ্রামের বাজারীয়া দলের অধিনায়ক ছিলেন। এই সময়ে বাদলগ্রামনিবাসীরা দুই দলে বিভক্ত ছিল, বাজারীয়া দল ও ব্রহ্মজ্ঞানীর দল। একদা গ্রামের মাঝের-পাড়ানিবাসী হরিহর বসু ধোবা পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া নূতন ধর্ম্মসংস্কারক রামমোহন রায়ের গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন, এমৎ সময়ে গ্রামের প্রধান পণ্ডিত রামধন তর্কবাগীশ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। হরিহর বসু রামমোহন রায়ের গ্রন্থ পড়িতেছেন দেখিয়া "ছোঁড়া! তুই

রামমোহন রায়ের গ্রন্থ পড়ছিস্” এই বলিয়া তাঁহার হাত হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়া পুকুরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। হরিহর বসু ও তাঁহার সঙ্গীগণ বেদান্ত শাস্ত্রের ও রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা সর্ব্বদাই করিতেন বলিয়া গ্রামে তাঁহাদিগের নাম ব্রহ্মজ্ঞানীর দল হইয়াছিল। বাজারীয়া দলের লোকেরা গ্রামের ঠনঠনিয়া বাজারে বসিয়া গাঁজা খাইতেন ও বাজারের লোকের নিকট হইতে তোলা তুলিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এই কথা ব্রহ্মজ্ঞানীর দলের লোকেরা শ্রীরামপুরের মার্শমান সাহেবের সম্পাদিত “সমাচার-দর্পণে” ছাপাইয়া দেন। এই সমাচার-দর্পণ বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র। সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় যে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় তাহার নাম “বেঙ্গল গেজেট”; গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য তাহার সম্পাদক ছিলেন। সমাচার-দর্পণে ঐ সংবাদ প্রকাশিত হওয়াতে দারগা গ্রামে আসিয়া সুরথাল করে। বাজারীয়া দলের লোকেরা অতি ন্যায়বান ছিলেন। বর্গীরা অধীনস্থ রাজাদিগের নিকট হইতে “চৌত” অর্থাৎ তাঁহাদিগের আয়ের চতুর্থাংশ লইত। কিন্তু ইহারা বাজারে যে সকল লোক আসিত তাহাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের দ্বারা বিক্রীত দ্রব্যের যে অংশ লইতেন তাহা চৌতের সহিত তুলনা করিলে অতি অল্প। তাঁহারা বাজারের লোকদিগকে বলিতেন, “তোরা মজা করিয়া খাইবি, আর আমরা

ভদ্র লোকের ছেলে কিছু খাইতে পাইব না, ইহা কি ভাল দেখায়? তোরা অধিকাংশ নে, আমাদের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দে তাহা হইলেই আমাদিগের হইবে।" ইহা অপেক্ষা ন্যায়সঙ্গত কথা আর কি হইতে পারে? তাঁহারা এরূপ ন্যায়সঙ্গত কার্য্যের সহিত দারগার কোন সম্বন্ধ আছে ইহা স্বপ্নের অগোচর মনে করিয়া ত্বরিতানন্দের দম মারত (পাঠকবর্গ "মারত" শব্দের রত অংশটুকু "রত" শব্দের ন্যায় উচ্চারণ করিবেন) নির্ব্বাণ-সুখ উপভোগ করিতেন। এক দিন প্রাতে দারগা সুরথাল করিতে আসিয়াছে ইহা হঠাৎ শুনিয়া তাঁহারা নির্ব্বাণ-নিদ্রা হইতে জাগরিত হন। ইহাঁরা যোগ সাধনে অন্যান্য স্থানের যোগী অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন। কলিকাতার কোন যোগাশ্রমে একটী নরহত্যা হইয়াছিল, কিন্তু যোগীরা সে হত্যাকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন না। তাঁহারা শুনিলেন যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাদিগের আড্ডায় সুরথাল করিতে আসিবেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে সুরথালের অর্থ সুর ও তালে মাজিষ্ট্রেটের নিকট সাক্ষী দেওয়া। এই মনে করিয়া তাঁহারা ঘুঙ্গুর পায়ে দিয়া ও মন্দিরা হাতে করিয়া সজ্জিত হইয়া রহিলেন। সাহেব আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা জগবন্ধু বোসের হত্যার বিষয় কিছু জান?" তখন তাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়া

"জগবন্ধু বোসকে জানিনে ও সাহেব জানিনে
জানিনে, শুনিনে, চিনিনে ও সাহেব চিনিনে॥"

এই গান গাহিয়া সাহেবের চতুর্দ্দিকে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। সাহেব অবাক হইয়া রহিলেন। এই সকল যোগীদিগের অপেক্ষাকৃত অধিকতর চালাকি ছিল। বাজারীয়া দলের লোকদিগের এত অধিক চালাকি ছিল না। যোগসাধনে লোকে যত অগ্রসর হয় ততই নিস্পন্দতা বৃদ্ধি হয়। বাজারীয়া দলের লোকদিগের তোলা তুলিবার ও আহার করিবার সময় বাহ্যজ্ঞান হইত, অন্য সময় তাঁহারা নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থাতেই থাকিতেন। আহা! এরূপ ন্যায়বান উদারস্বভাব যোগসাধনকারীদিগের প্রতি খবরের কাগজে বদনাম ছাপান ও দারগার দ্বারা সুরথাল করান রূপ নৃশংস ব্যবহার করা কি উচিত ছিল? এই কার্য্য জন্য ব্রহ্মজ্ঞানীর দলের লোকের আত্মা এক্ষণে রৌরব নরকে পচিতেছে সন্দেহ নাই। পাঠক! (আমরা কোন কোন বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সম্পাদকের ন্যায় সর্ব্বদা পাঠককে সম্বোধন করিতে ভালবাসি) কে না জগতে গাঁজাখোর? বণিক যিনি হাজার টাকার মূলধন খাটাইয়া বাণিজ্য আরম্ভ করেন, এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই ক্রোরপতি হইবেন এমং দিবা-স্বপ্ন দেখেন তিনি কি গাঁজাখোর নহেন? বিজেতা যিনি এক সামান্য দেশ জয় করিয়া মনে করেন যে ক্রমে ক্রমে আমি সসাগরা পৃথিবীর রাজা হইব, তিনি কি গাঁজাখোর নহেন? গ্রীসের অন্তর্গত ইপাইরস (Epirus) নামক প্রদেশের রাজা পিরস (Pyrrhus) এইরূপ গাঁজা-

খোর ছিলেন। ইঁহাকে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বড় জব্দ করিয়াছিলেন। পিরস একদিন সেই জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট অমুক দেশের পর অমুক দেশ এইরূপ দশ বারটা দেশ ক্রমে জয় করিব এমন মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করিলেন। জ্ঞানী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন "এই সকল দেশ জয় করিয়া তৎপরে আপনি কি করিবেন?" পিরস উত্তর করিলেন "এই সকল দেশ জয় করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুবান্ধব সহিত আমোদ আহ্লাদ করিব।" জ্ঞানী ব্যক্তি বলিলেন, "তাই যদি আপনার অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে এত আয়াস স্বীকার না করিয়া এখনই ত তাহা করিতে পারেন।" গাঁজাখোরকে গাঁজার নেশার সময় বাড়ী মারিলে তাহার যেমন চৈতন্যের উদয় হয় তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তির ঐ কথায় পিরসের চৈতন্যের উদয় হওয়াতে তিনি বলিলেন, "তাই ত বটে।" যে সকল ব্যক্তিরা কেবল বৈষয়িক উন্নতি সম্বন্ধে অমূলক আশা করে কেবল যে তাহারাই গাঁজাখোর এমত নহে। গ্রন্থকার ও বিদ্বান ব্যক্তিরাও গাঁজাখোর। কবি ও উপন্যাসলেখকেরা যে সম্পূর্ণরূপে গাঁজাখোর তাহা আর প্রমাণ করিতে হইবে না। পুরাবৃত্তলেখকও গাঁজাখোর। পুরাবৃত্ত বিশেষতঃ প্রাচীনকালের পুরাবৃত্তের চৌদ্দ আনা গাঁজা ও দুই আনা প্রকৃত পদার্থ। ইংরাজী কবি লর্ড বায়রণ বলিয়াছেন, "That grand liar history" "সেই প্রকাণ্ড মিথ্যা

বাদী যাহাকে পুরাবৃত্ত বলা যায়।” ইংলণ্ড দেশের বিখ্যাত কবি পুরাবৃত্তলেখক ও রাজনীতিজ্ঞ সার ওয়াল্‌টার রেলে (Sir Walter Raleigh) কারারুদ্ধাবস্থায় পৃথিবীর ইতিহাস রচনা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এক দিন তাঁহার কারাগৃহের একতলাতে একটী কলহ উপস্থিত হয়। কলহ শেষ হইলে যখন যে ব্যক্তি রেলের দ্বিতলস্থ গৃহে আগমন করিল, তাঁহাকে তিনি ঐ কলহের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দিল। রেলে বলিলেন, “যে ঘটনা প্রায় আমার সম্মুখে ঘটিল তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত যখন আমি পাইলাম না তখন হানিবল, সিপিয়ো ও সিজারের প্রকৃত বৃত্তান্ত পাওয়া যাইতেছে তাহা কি করিয়া বলা যাইতে পারে?” কবি, উপন্যাস লেখক ও পুরাবৃত্ত-রচয়িতার ত এই কথা গেল। দার্শনিকও গাঁজাখোর। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তার ন্যায় আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করিয়া সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব বিষয়ে স্বীয় কুলকুণ্ডলিনী হইতে কত মত উদ্ভাবন করেন, পরকালে যখন তাঁহার জ্ঞান অনেক উন্নত আকার ধারণ করিবে ও গাঁজার ঝোঁক ভাঙ্গিবে তখন ঐ সকল মত অনেক পরিমাণে গাঁজামূলক ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়া আপনা আপনি হাসিবেন এবং সে সকল ভ্রমাত্মক মত পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছেন বলিয়া লজ্জিত হইবেন। এইরূপে জগতের সকল ব্যক্তিই যে গাঁজাখোর তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। পানাসক্ত গ্রীক কবি

এনাক্রিয়ণ (Anacreon) বলিয়াছেন যে জগতের সকল পদার্থ পান কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, বৃক্ষ সকল পৃথিবীর রস পান করিতেছে, পৃথিবী বৃষ্টি পান করিতেছে, সূর্য্য বাষ্পরূপে জল পান করিতেছে। সেইরূপ আমরা প্রমাণ করিতে পারি যে সমস্ত জগত গাঁজা খাইতেছে। যখন সমস্ত জগৎ গাঁজা খাইতেছে তখন বাদল গ্রামের বাজারীয়া দলের লোককে আমরা দোষ দিই কেন? বাজারীয়া দলের অধিনায়ক শিবচন্দ্র ঘোষ কিন্তু নিজে গাঁজা খাইতেন না। তিনি এ বিষয়ে তাঁহার সখা (সমান আখ্যা অর্থাৎ সমান নামধারী ব্যক্তিকে সখা বলা যায়) কৈলাসবাসী দেবতার ন্যায় গাঁজাখোর ছিলেন না। যেমন চতুর রাজনীতিজ্ঞ কিম্বা সেনাপতি নিজে ধর্ম্মোন্মত্ত না হইয়া অনুবর্ত্তীদিগের ধর্ম্মোন্মত্ততা দ্বারা আপনার কার্য্য সাধন করিয়া লয়েন তেমনি শিবচন্দ্র ঘোষজা মহাশয় নিজে গাঁজা না খাইয়া গাঁজাখোরদিগের দ্বারা আপনার কার্য্য সাধন করিয়া লইতেন। তিনি এ বিষয়ে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। নেপোলিয়ান যেমন মিসর দেশে গিয়া দাড়ী রাখিয়া ও কলমা পড়িয়া মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন দেখাইয়াছিলেন কিন্তু বাস্তবিক মুসলমান হয়েন নাই, সেইরূপ শিবচন্দ্র ঘোষজা মহাশয়ের ধরণ ধারণ গাঁজাখোরের ন্যায় ছিল, কিন্তু তিনি নিজে গাঁজাখোর ছিলেন না। শিবচন্দ্র ঘোষ কৃশকায় ও অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। কৃশকায়

বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রকাণ্ডকায় বলবান অথচ নির্ব্বোধ ব্যক্তি অপেক্ষা যে কত শ্রেষ্ঠ তাহা তিনি একটী সুন্দর উপমা দ্বারা দেখাইতেন। তিনি বলিতেন যে প্রকাণ্ডকায় বলবান অথচ নির্ব্বোধ ব্যক্তি পাঁড়কুমড়ো ও ছিপ্ ছিপে বুদ্ধিমান ব্যক্তি একটী ছোট ছুরী। যেমন একটী ছোট ছুরী দ্বারা পাঁড়কুমড়ো অনায়াসে কাটা যায় তেমনি কৃশকায় ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রকাণ্ডকায় বলবান অথচ নির্ব্বোধ ব্যক্তিকে সকল বিষয়েই হারাইয়া দিতে পারে। শিবচন্দ্র ঘোষজা মহাশয় সৌর-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইলে তাঁহার খাওয়া হইত না। সূর্য্য প্রকাশ হইলে খাইতেন। কখন কখন এই জন্য এক দিন দুদিন তাঁহাকে উপবাস করিতে হইত। শিবচন্দ্র ঘোষজা মহাশয়ের প্রধান দোসর করালী চরণ নাগ ছিলেন।

"—Next himself in power, next in crime."

—*Milton.*

"গণনীয় তাঁর পরেই পদে ও দোষে।"

শিবচন্দ্র ঘোষজা মহাশয়ের আর এক দোসরের নাম ছিল বাই শম্ভু। লোকে তাঁহাকে বাই শোম্ভো বলিয়া ডাকিত। ছেলে বেলা যখন আমরা বাই-শোম্ভোকে দেখি নাই তখন এই বাই-শোম্ভো নাম শুনিলে ভয়ে বুক গুর গুর করিত। তাঁহাকে উনপঞ্চাশ বাই মূর্ত্তিমান অতি উগ্রচণ্ডা লোক বলিয়া বোধ হইত। বস্তুতঃ তিনি এরূপ

ছিলেন না। তিনি একজন সদানিমীলিতনেত্র ধ্যাননিরত পরমযোগী ছিলেন কিন্তু যোগী হইয়াও যুদ্ধ সময়ে বারত্ব প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিতেন না। তিনি অমিতবলশালী ছিলেন। তিনি দাঙ্গার সময় বিলক্ষণ লাঠি চালাইতে পারিতেন। স্কটের আইবানহোর ক্লার্ক অব্ কোপম্যানহার্ষ্ট (Clerk of Copmanhurst) যেমন পাদ্রীও ছিলেন এবং লাঠিয়ালও ছিলেন ইনি সেইরূপ যোগীও ছিলেন ও লাঠিয়ালও ছিলেন। এই বাজারীয়া দল ও ব্রহ্মজ্ঞানীর দল অনেক দিন হইল বাদল গ্রাম হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। ঐ দুই দলের লোকেরা স্বপ্নেও মনে করেন নাই যে কোন ভাবী পুরাবৃত্তলেখক তাঁহাদিগকে অমরতা প্রদান করিতে চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা সফল হইবে কিনা তাহা বিধাতাই জানেন।

রামনিধি ঘোষ।

বৈদ্যেরা বলেন উনপঞ্চাশ প্রকার বায়ু আছে, কিন্তু আমরা বলি উনপঞ্চাশকে বর্গ করিলে যত হয় অর্থাৎ দুই হাজার চারি শত এক প্রকার বায়ু আছে। কোন খোনার সঙ্গীতের প্রতি প্রবলানুরাগ ছিল কিন্তু তাহাকে সঙ্গীত তত আসিত না। সে একদিন এক মাঠে নির্জ্জনে গান গাহিতে গাহিতে সানুনাসিক স্বরে বলিল "আমারই ভাল লাগ্‌ছে না ত অন্য লোকের ভাল লাগ্‌বে কি।" এই ব্যক্তি আপনার গাওনা এত নিকৃষ্ট জ্ঞান করিয়াও সর্ব্বদা

সঙ্গীতবিরত হইত না। এরূপ সঙ্গীতানুরাগ একপ্রকার বায়ু। বীণাপাণির পায়ে ক্রমিক মাথা খোঁড়া হইতেছে, কিন্তু বীণাপাণি অনুগ্রহ করিতেছেন না, তথাপি কবিতা লিখিতে হইবে; ইহা একপ্রকার বায়ু। সংবাদ-পত্র লিখিয়া কোন আয় হইতেছে না অথচ ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়াইতে হইবে ইহা আর একপ্রকার বায়ু। কেহ কেহ বৃহৎ পুস্তক লিখিতে পারেন না, কিন্তু অসংখ্য পুস্তিকা প্রকাশ করিতেছেন, চটীর পর চটী উড়াইতেছেন; কেন উড়াইতেছেন, তাহার কারণ বুঝা যায় না; ইহা আর এক প্রকার বায়ু। এইরূপ বায়ু ধরিতে গেলে বায়ুর সংখ্যা দুই হাজার চারি শত একের বরং অধিক হইবে, কম হইবে না। এই সকল দৃষ্টান্ত একবিষয়ী বায়ুর (Monomania) দৃষ্টান্ত। এই এক বিষয়ী বায়ুর অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উদাহরণ শুনা গিয়াছে। বিলাতে নিয়ম আছে কোন ব্যক্তি উন্মাদগ্রস্ত হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজসন্নিধানে তাঁহার মনের অবস্থা বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান প্রার্থনা করিয়া বিচারক সমীপে যদি তাঁহার মনের অসুস্থতা প্রমাণ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন। ইংলণ্ডে এইরূপ কোন বিকলমানস সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে এইরূপ বিচারক নিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারকেরা তাঁহাকে এক সহস্র প্রশ্ন করিলেন, তিনি সহজ লোকের ন্যায় সকল

প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন তথাপি উহাঁর মনোবিকার প্রমাণিত হইল না। বিচারকেরা তাঁহার উত্তরাধিকারী মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছে বলিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আদালতের রীত্যনুসারে প্রশ্নোত্তর পত্রে সহি করিবার সময় আপনার নাম না লিখিয়া জিসস্ ক্রাইষ্ট বলিয়া সই করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তিনি যীশুখৃষ্ট হইয়াছেন। কোন ব্যক্তির ভৃত্য নিজে গাড়ু হইয়াছে মনে করিয়া তাহার প্রভু কুঠী হইতে ফিরিবার সময়ে আপনার মস্তকের উপর একখানি গামছা রাখিয়া এবং গাড়ুর নলের মত ডান হাত আপনার নাকে সংলগ্ন করিয়া প্রভুর প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে দৃষ্ট হইয়াছিল। সে এইরূপ মধ্যে মধ্যে করিত। কোন ব্যক্তি হঠাৎ একবিষয়ী বায়ু দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিলেন তাঁহার মাথা নাই। সকল বিষয়ে সজ্ঞান ব্যক্তির মত আচরণ করিতেছেন কিন্তু মাথা কোথা গেল মাথা কোথা গেল এই বলিয়া ব্যতিব্যস্ত হইলেন। আমরা এইরূপ উচ্চ বায়ুর অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের সে উদ্দেশ্য নহে। সামান্য বায়ুরোগ যাহাকে বলে বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহা বিবৃত করা আমাদিগের উদ্দেশ্য। সে বায়ু রোগের অন্য নাম স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য। তাহার প্রধান লক্ষণ অমূলক উদ্বেগ, অমূলক আশঙ্কা ও অমূলক সন্দেহ। ইহার সহিত শিরোভ্রমণ বা

মাথা ঘোরা ও বুক দুর দুর সংযুক্ত থাকে। যদি কেহ দরজা ঝনাৎ করিয়া বন্ধ করিল এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তি তাহাতে ভয়ে আকুল হয়েন। যদি তিনি অপর কোন ব্যক্তিকে রাস্তায় দৌড়িয়া যাইতে দেখেন তাহা হইলে তাঁহার বুক্ গুর গুর করে। এই রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তি এক তেতলার ছাদের উপব বসিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমার ভয় হইতেছে এই তেতলার বাটী পাছে হঠাৎ পড়িয়া যায়।" এইরূপ রোগগ্রস্ত আর এক ব্যক্তি সর্ব্বদা আশঙ্কা করিতেন যে ছাদের নিম্নভাগ হইতে একটা ইট তাঁহার মাথার উপর খসিয়া পড়িবে। আহারের সঙ্গে কোন অনিষ্টকর দ্রব্য মিশ্রিত হইবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও এরূপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা মনে করেন যে তাহার সঙ্গে তাহা মিশাইয়া পড়িয়াছে। এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদা অকারণ ভয় ও অকারণ সন্দেহ। এই রোগের অবস্থার পর অবস্থা আছে। ইহার চরম অবস্থা শূন্যে অসংখ্য বিকট মূর্ত্তি দেখা। কিন্তু এই পীড়ার সকল অবস্থাতে জ্ঞান থাকে। রোগী কখন জ্ঞান হারায় না। ইহা আরও যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠে। স্পষ্ট উন্মাদাবস্থায় লোকে জ্ঞান হারায়, যাতনা অধিক অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু এই পীড়াতে জ্ঞান থাকাতে রোগী অতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করে। এই পীড়া নিরাকার পীড়া। অন্য পীড়া ইহার সহিত সংযুক্ত না থাকিলে

লোকে কখন মনে করিতে পারিত না যে উক্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কোন পীড়া আছে। বেশ খাচ্চে, দাচ্চে, বেড়াচ্চে, পুষ্ট হইতেছে কিন্তু রোগ আছে। অতএব এপ্রকার পীড়ার সহিত লোকের সহজে সহানুভূতি হয় না, কিন্তু তজ্জন্য যন্ত্রণা কম হয় না। এইরূপ পীড়াগ্রস্ত কোন ব্যক্তির বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন তোমার পীড়া কল্পনা-মূলক, বাস্তব পীড়া নহে। তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, যে দার্শনিক বিচার দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে কেবল এরোগ কেন সমস্ত জগৎই কল্পনা-মূলক। আমরা উপরে বলিয়াছি যে এ রোগের বিলক্ষণ যন্ত্রণা আছে। এই রোগাক্রান্ত আমাদিগের কোন গুরুজন বলিতেন, যে অতি বড় শক্রর যেন এ পীড়া না হয়। কোন কোন অপ্রকৃত কবি যে পদ্য লিখেন, তাহা প্রকৃত পদ্য নহে, তাহা পাগলাগদ্য (Prose run mad) কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি আদৌ পদ্য লিখেন না, কেবল গদ্য লিখেন। কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত কবি। গদ্যে প্রকৃত কবিতার একটী দৃষ্টান্ত ফরাসিস ভাষায় ফেনেল রচিত টেলিমেকস। বাদল গ্রামে একটী কবি জন্মিয়াছেন। তাঁহার নিজের মতে না হউক অন্য অনেকের মতে তিনি পদ্য না লিখিয়াও প্রকৃত কবি। তিনি নিজে এই রোগ গ্রস্ত। তিনি এই রোগের যন্ত্রণা বিষয়ে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা বানাইয়াছেন সে আখ্যায়িকাটী এই,—ব্রহ্মা

যখন সকল রোগের সৃষ্টি করিলেন, তখন বায়ু রোগেরও সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু বায়ুরোগকে প্রবল পরাক্রান্ত অর্থাৎ মারাত্মক করিলেন না, তাহাতে বায়ুরোগ ক্ষুব্ধ হইয়া করযোড়ে ব্রহ্মার নিকট বলিলেন, "ঠাকুর! আমার কি দুষ্কৃতি যে সকল রোগকে আপনি প্রবল পরাক্রান্ত করিলেন কিন্তু আমাকে করিলেন না। অন্য রোগে মানুষ মারিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু আমি তাহা পারি না। ব্রহ্মা উত্তর করিলেন, "বা! হে! তুমি যে শরীরে প্রবেশ করিবে সে সর্ব্বদাই মরিয়া থাকিবে। তাহার আর মৃত্যুর আবশ্যক করে না।" যতই জগতে সভ্যতা বৃদ্ধি হইতেছে ততই মানসিক পরিশ্রমের আতিশয্যজনিত এই রোগের বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা "ইংরাজিতে Recreations of a Country Parson নামক একখানি পুস্তক পড়িয়াছি। ঐ গ্রন্থের রচয়িতা এক জন পাদ্রি। তাহাতে লেখক বলিয়াছেন যে ইংলণ্ডে এই রোগ বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন যে এই রোগগ্রস্ত তাঁহার কোন বন্ধু পাছে কোন মন্দ খবর পান বলিয়া ডাকের চিঠি খুলিতে ভয় করিতেন। এই রোগগ্রস্ত তাঁহার আর এক বন্ধু একবার রেলের গাড়িতে যাইবার সময় ঠিকানায় গাড়ী পৌছিলে টিকিটকলেক্টর তাঁহার নিকট টিকিট চান, জামার পকেটে শীঘ্র টিকিট না পাওয়াতে বেচারা কাঁপিতে আরম্ভ করিল।

ঐ পাদ্রি সাহেব বলেন যে ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী (Sir Robert Peel) সার রবার্ট পীলের এই রোগ ছিল। তিনি এক দিন লণ্ডনের পশুশালা দেখিতে গিয়াছিলেন ; হঠাৎ একটা বানর তাঁহার কাঁদের উপর লাফাইয়া পড়াতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাদ্রি সাহেব বলেন যে এরূপ সভ্য লোক অপেক্ষা অক্ষুণ্ণ-স্নায়ু কঠিনচিত্ত জুলুরা ভাল। তাহারা কোন বিপদকে বিপদ জ্ঞান করে না।

উন্মাদ রোগ মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয়, কিন্তু এই রোগ উদর সম্বন্ধীয়। ইহা অজীর্ণ (Dyspepsia) জনিত। অজীর্ণ দুই প্রকার ; একপ্রকার অজীর্ণ অধোগামী, আর এক প্রকার অজীর্ণ ঊদ্ধগামী। অধোগামী অজীর্ণে উদরাময় পীড়া জন্মে, আর ঊদ্ধগামী অজীর্ণে মাথা গরম করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। ইংলণ্ডের সুরসিক পাদ্রী সিড্‌নি স্মিথ্‌ (Sydney Smith) বলেন যে পৃথিবীর অৰ্দ্ধেক দুঃখ অজীর্ণ রোগ হইতে উৎপন্ন। তিনি বলেন,—"আমার কোন বন্ধু অনেক রাত্রিতে আহার করেন। তিনি বিলক্ষণ মসলাওয়ালা ঝোল খান, তাহার পর একটা বৃহৎ গল্লা চিংড়ি খান এবং তাহার পর অম্বল খান। পরিশেষে এই সকল অত্যুৎকৃষ্ট বিচিত্র দ্রব্য কয়েকটীকে আপনার উদর মধ্যে মদ্য দ্বারা গুলিয়া ফেলেন। তাহার পর দিন প্রাতে গিয়া দেখি তিনি তাঁহার বসতবাটী বিক্রয়

করিয়া পল্লীগ্রামে বসতি করিতে সংকল্প করিতেছেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার শরীরের অবস্থা জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন তাহার বায়ু ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, সময়ে পল্লীগ্রামে না পলাইলে তাঁহার আর নিস্তার নাই। এই সমস্ত উদ্বেগের কারণ সেই বৃহৎ গল্দা চিঙ্গড়িটী। যখন ভারাক্রান্ত প্রকৃতি সময়ে ঐ দাড়াওয়ালা জিনিষ হজম করিয়া ফেলিয়াছে, তখন গিয়া দেখি যে তাঁহার কন্যা সুস্থ হইয়াছে, তাঁহার অবস্থা ভাল হইয়াছে, এবং সকল পল্লিগ্রামীয় ভাব তাঁহার মন হইতে চলিয়া গিয়াছে। এইরূপে অগ্নিদগ্ধ পানির আহার জন্য কত পুরাতন বন্ধুতা বিনষ্ট হয় এবং অনেক দিন ধরিয়া নুণ দিয়া জারানো কঠিন মাংসাহার কত লোকের মনে আত্মহত্যা-প্রবৃত্তি জন্মায়। শরীরের অসুখ মনের অসুখ উৎপাদন করে এবং এক গ্রাস দুষ্পাচ্য আহার বৃহদাকার দুঃখ উৎপাদন করে। মানবীয় সুখ মানবীয় শরীর-তত্ত্ব-বিজ্ঞানের প্রতি এতদূর নির্ভর করে।” যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়া মানসিক পরিশ্রম বৃদ্ধি করে তত স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়া অজীর্ণ উৎপাদন করে। সেই অজীর্ণ হইতে উক্ত প্রকার বায়ু রোগের উৎপত্তি হয়। সে কালের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা সকাল বিকাল পরিশ্রম করিতেন মধ্যাহ্নে আহার করিয়া বিশ্রাম করিতেন, অষ্টমী প্রতিপদে পাঠ দিতেন না, সমস্ত বর্ষাকাল মেঘ গর্জ্জন জন্য

পড়াইতেন না, কুড়ি পঁচিশ বৎসরে "ত্রৈলোক্য চিন্তামণি"* নামক ন্যায়ের এক খানি টীকা লিখিতেন। কিন্তু এক্ষণে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যেরূপ মানসিক পরিশ্রম বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে বিলক্ষণ উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। এইরূপ মানসিক পরিশ্রম শীতদেশবাসী, আর্য্যজাতির প্রধান আহার গোমাংসভোজী, শক্তহাড় লোকদিগেরই পোষায়। পাঠক অবশ্য গ্রীষ্মকালে কোন কোন দিনে অসংখ্য পিপীলিকাকে পালকবিশিষ্ট হইয়া উড়িতে দেখিয়াছেন। সেইরূপ এক্ষণে অসংখ্য গ্রন্থ অসংখ্য সম্বাদপত্র ও অসংখ্য সাময়িক পত্রিকা চতুর্দ্দিকে উড়িতেছে। এই সকল গ্রন্থ ও পত্রিকা লেখকদিগকে আমরা বলি, "এখন এইরূপ করিতেছেন, কিন্তু 'এক রোজ মজা মালুম হোগা।' একদিন এইরূপ প্রভূত মানসিক পরিশ্রম জন্য আপনাদিগকে কষ্ট পাইতে হইবে।" "পিপীড়ার পালক উঠে মরিবার তরে।" পাঠক এইস্থল পাঠ করিয়া বলিতে পারেন "আপনারাও ত সংবাদপত্র সম্পাদক।" তাহার উত্তর এই যে পালক উঠা সংক্রামক রোগ। আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনাদিগের রোগের দ্বারা আমরা সংক্রামিত হইয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের একমাত্র প্রবোধের কারণ এই যে দশ জনের ভাগ্যে যাহা আছে, আমাদেরও ভাগ্যে তাহাই হইবে।

* "ত্রৈলোক্য চিন্তামণি" বায়ুরোগের একটী ঔষধ। আমরা এই নামটী আয়ুর্ব্বেদ হইতে ধার করিয়া ন্যায়ে খাটাইলাম।

বায়ুরোগের ঔষধ কি? আয়ুর্ব্বেদ কর্ত্তারা বলেন, "নচ তৈলাৎ পরং নাস্তি ঔষধং মারুতাপহং" "বায়ু রোগের তৈল অপেক্ষা ঔষধ আর নাই" "মধুরৈঃ শীতলৈঃ পথ্যৈঃ জামাতৃবৎ সেবয়েৎ" "মিষ্ট ও শীতল দ্রব্য দ্বারা এই রোগকে জামাতার ন্যায় সেবা করিবে" কিন্তু আমাদিগের মতে এই রোগ নিবারণের প্রধান উপায় পরিমিত আহার করা, কোন দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভক্ষণ না করা এবং রোগের প্রতি আত্মার বল নিয়োগ করা। এ রোগ যেমন আত্মার বলের অধীন এমন অন্য কোন রোগ নহে। একটী ইংরাজী-অধ্যায়ী চালাক বাঙ্গালী বালক এই রোগগ্রস্ত আমাদিগের কোন বন্ধুকে এই রোগের এমন একটী ঔষধ বলিয়া দিয়াছেন যে সে ঔষধের মত আর কোন ঔষধ নাই। সে তাঁহাকে বলিল "You should be angry with the disease" "এই রোগের প্রতি বিলক্ষণ ক্রোধ করিবেন তাহা হইলে তাহা নিবারিত হইবে।" "কোন মতে আমার মনকে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে দিব না,' এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ইহার প্রধান ঔষধ।" Recreations of a Country Parson বলেন যে এ রোগের প্রধান ঔষধ মানসিক পরিশ্রম যাহাতে না হয় এবং উৎকট শারীরিক পরিশ্রমও না হয় এরূপ কোন কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকা। এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ শারীরিক পরিশ্রম করিতে অত্যন্ত পরাঙ্মুখ, কিন্তু

ইহাদিগের পক্ষে শারীরিক পরিশ্রম বিশেষ আবশ্যক। ইংরাজী কবি গ্রীন (Green) এই রোগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—Fling but a stone, the giant dies." "একটী মাত্র ঢিল ছোড়, অসুর মরিবে।" তিনি একটী সামান্য প্রস্তর দ্বারা বাইবেলে উল্লিখিত সামসন নামক দৈত্য বধের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া এই কথা বলিয়াছেন। এই রোগগ্রস্ত কোন কোন ব্যক্তি একেবারে জীবনের কার্য্য পরিবর্ত্তন করাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। গ্রন্থ রচনা অথবা পত্রিকা সম্পাদন কার্য্য একেবারে ছাড়িয়া কোদ্দাল ধরাতে অনেকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। আমরা এক্ষণকার গ্রন্থকর্ত্তা ও পত্রিকা সম্পাদকদিগকে ইহা করিতে পরামর্শ দিই। তাঁহারা "অগ্রে আপনি ধরুন তাহার পর আমরা ধরিব" এই কথা বলিতে পারেন তাহা আমরা স্বীকার করি। আমরা এ বিষয়ে কত বলিতে পারি তাহার সীমা নাই।

শুকদেব বসু।

বাদল গ্রামের দেওয়ান ঘোষ বংশ ও জমিদার ঘোষ বংশের পর মাঝের পাড়ার বসু বংশ গণনীয়। এই বসু বংশের আদি পুরুষ শুকদেব বসু। ইংরাজেরা দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে কলিকাতার যে দান পত্র প্রাপ্ত হয়েন তাহাতে লিখিত থাকে যে তাঁহাদিগকে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটী গ্রাম প্রদত্ত হইল।

এই তিনটী গ্রাম লইয়া বর্ত্তমান কলিকাতা সংরচিত। তৃতীয় উইলিয়ম রাজার রাজত্বকালে ১৬৯৮ অব্দে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লা ঐ গোবিন্দপুর গ্রামে নির্ম্মিত হয়। সেই অবধি ঐ গ্রামের নাম গড় গোবিন্দপুর হয়। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণ জন্য যে যে লোকের জমি লওয়া হয় তাহাদিগকে সেই সেই জমির পরিবর্ত্তে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সুতানুটি ও খাস কলিকাতায় জমি দেন। পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয় খাত (Moharatha Ditch) এবং পশ্চিমে জগন্নাথের ঘাট ইহার মধ্যস্থিত বৃহদায়তন ভূমিখণ্ডের নাম সুতানুটি ছিল। দুর্গ নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা গোবিন্দপুর হইতে তাড়িত হয়েন তাঁহাদিগের মধ্যে গোবিন্দপুরের বসু বংশীয় লোকেরা ছিলেন। ইহাঁরা নিজ নিজ পৈতৃক জমির পরিবর্ত্তে কলিকাতার এথেন্স (Athens) সিমুলিয়া, দরমাহাটা ও বাগবাজারে জমি প্রাপ্ত হয়েন। কলিকাতার সিমলা অঞ্চলে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোর গির্জ্জা, ডফ্‌সাহেবের স্কুল, ও "ভারতবর্ষীয় কবি" উপাধিধারী কাশী প্রসাদ ঘোষের বাটী থাকাতে পূর্ব্বে কোন কোন বিদ্বান্‌ ব্যক্তি ঐ স্থানকে কলিকাতার এথেন্স বলিয়া ডাকিতেন। এক্ষণে পটলডাঙ্গা ঐ নামের উপযুক্ত। সে কালে সিমুলিয়াবাসী বসুদিগের মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ বসু, দরমাহাটার বসুদিগের মধ্যে নয়ানচন্দ্র বসু, এবং বাগ-বাজারের বসুদিগের মধ্যে কাশীনাথ বসু প্রধান ছিলেন। নয়ানচন্দ্র বসু তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

কাশীনাথ বসু সেকালের একজন বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন। তিনি অন্যান্য গ্রন্থ মধ্যে "বিজ্ঞান কুসুমাকর" নামক বহুল সংস্কৃত শ্লোকপূর্ণ একটী পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি যে যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার প্রথমে একটী করিয়া গণেশদেবের ছবি থাকিত। ইনি গাণপত্য ছিলেন। শুকদেব বসু সিমুলিয়া নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বসু প্রমুখ বসু-দিগের মধ্যে একজন। ইনি বাদল গ্রামে বিবাহ করিয়া তথায় বসতি করেন। কথিত আছে শুকদেব বসু পাণ্ডু-রোগাক্রান্ত হইয়া বৈদ্যনাথে হত্যা দিবার জন্য তথায় যাত্রা করেন। আমরা পূর্ব্বে বাদল গ্রামের যে ভৌগলিক বিবরণ দিয়াছি তন্মধ্যে দিবির আড়ার সংস্থিত ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর মঠের কথার উল্লেখ আছে। বৈদ্যনাথ স্বপ্ন দিলেন যে তোমার আর বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত যাইবার আবশ্যক নাই। প্রাতঃকালে ত্রিপুরাসুন্দরীর মঠের সুরকি ও রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে তাহার চূর্ণ প্রত্যহ কিছুদিন খাইলে তুমি আরোগ্য লাভ করিবে। কি অনুপানের সহিত ঐ চূণ ও সুরকি সেবন করিতে হইবে তাহাও বৈদ্যনাথ বলিয়াছিলেন। বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলেন যে পাণ্ডুরোগে পুরাতন চূণ ও সুরকি সেবন উপকার প্রদান করে। স্বপ্নে যে আমরা কোন কোন আবিষ্ক্রিয়া কিম্বা প্রতিভাসূচক কার্য্য করিতে সক্ষম হই ইহা প্রসিদ্ধ কথা। কবিবর কোলরিজ (Coleridge) স্বপ্নে "কবলে খাঁ" শিরস্ক কল্পনাশক্তির পরাকাষ্ঠা-সূচক

কবিতা রচনা করেন। ইটালী দেশীয় সুবিখ্যাত বেহালা-ওয়ালা টার্টিনি (Tartini) শয়তানী স্বর নামক বিখ্যাত স্বর নিদ্রার সময় আবিষ্ক্রিয়া করেন। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে ছাগলের ন্যায় চেরা পা ও শিংবিশিষ্ট শয়তান (ইংরাজী-ওয়ালা পাঠকবর্গ অবশ্যই অবগত আছেন যে উক্ত ভদ্রলোকটী ঐ সকল শারীরিক লক্ষণ বিশিষ্ট; আমাদের একটী পাদ্রী বন্ধু বলেন যে তাঁহার সুদীর্ঘ "মোচ" ও "গোঁফ" ও আছে) আসিয়া তাঁহার বেহালা পাড়িয়া তাহাতে এমন এক স্বর বাজাইতে লাগিলেন যে তিনি একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন। টার্টিনি তৎক্ষণাৎ জাগিয়া নিজের যথার্থ বেহালা পাড়িয়া সেই স্বর বাজাইয়া তাহা আয়ত্ত করিলেন। তাহার পর যাহার যাহার নিকট ঐ স্বর বাজাইয়া ছিলেন তাহারা তাহার মধুরতায় বিগলিত হইয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল। গরীব যে আমরা আমরাও স্বপ্নে একবার একটী অতি উৎকৃষ্ট উপমা প্রাপ্ত হই। গ্রীষ্মকালে শুষ্ক ফল্গু নদীর উত্তপ্ত বালুকা কিঞ্চিৎ খনন করিলে দেখা যায় যে তাহার অব্যবহিত নিম্নে শীতল জলের প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে, সেইরূপ সংসারের দুঃখ কষ্টের অব্যবহিত নিম্নেই ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায়রূপ সুশীতল প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে, আমরা এই ভাবটী স্বপ্নে প্রাপ্ত হই। আমাদিগের কোন বন্ধু যিনি এক্ষণে বঙ্গদেশের পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের মধ্যে

প্রধান আসন অধিকার করেন তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার বাটীর মূর্চ্ছা (Hysterea) রোগগ্রস্ত কোন স্ত্রীলোক স্বপ্নে সেই রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঘোর দ্বিপ্রহর রাত্রে মূর্চ্ছা সময়ে অকস্মাৎ উঠিয়া একতলার একটা অন্ধকার ঘরে গমন করিয়া তাহার অপলস্তরা দেওয়ালের দুই ইটের মধ্যে সংস্থিত একটী দ্রব্য আনিয়া ভক্ষণ করাতে সেই রোগ হইতে একেবারে বিমুক্তি লাভ করেন। আমরা যে নিদ্রার সময় কোন কোন পরম সত্য লাভ করিতে সক্ষম হই ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু কি প্রকারে যে ঐ প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহা এপর্য্যন্ত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিতে সক্ষম হয়েন নাই। প্রকৃতিদেবী বড় সুরসিকা। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা হাজার তাঁহার অনুসরণ করুন তাঁহারা পরিশেষে যেখানে গিয়া থামেন দেখেন দেবী তাঁহাদিগের অনেক এগিয়ে গিয়া বসিয়া আছেন। তিনি কোন মতে ধরা দেন না। শুকদেব বসু উপরি-উক্ত ঔষধ দ্বারা নিজে আরোগ্য লাভ করিয়া অন্য অনেক লোককে তদ্দ্বারা আরোগ্য করাতে ঔষধের যশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। দেশ দেশান্তর হইতে লোক আসিয়া ঔষধ লইয়া যাইতে লাগিল। বৈদ্যনাথ স্বপ্ন দিয়াছিলেন যে শুকদেব বসুর বংশের লোক ব্যতীত অন্য লোকে ঐ ঔষধ হাতে করিয়া দিলে তাহার ফল ফলিবে

না। কিন্তু শুকদেব বসুর প্রপৌত্র ভূতপূর্ব্ব হিন্দু কলেজের ছাত্র রামনারায়ণ বাবু যখন মেলেরিয়া জন্য গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হয়েন তখন ঔষধ বিতরণ করিবার ভার গ্রামের বাঙ্গালাস্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি অর্পণ করিয়া আইসেন। তাঁহার হাতে উক্ত ঔষধ ফলশূন্য হয় নাই। কেনই বা হইবে ?

রামপ্রসাদ বসু।

রামপ্রসাদ বসু শুকদেব বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ঢাকার পরমিটের দেওয়ান ছিলেন। ঢাকার বস্ত্র বাণিজ্য নষ্ট হইয়া মেঞ্চেষ্টারের কাপড় যাহাতে অধিক বিক্রীত হয় এই অভিপ্রায়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ঢাকায় পরমিট বসাইয়াছিলেন। ফাঁসুড়ে যেমন গলায় ফাঁস দিয়া লোককে হত্যা করে তাহারা ঐরূপ পরমিট বসাইয়া ঢাকাই কাপড়ের বাণিজ্যের শ্বাসরুদ্ধ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া ছিলেন। যে ঢাকা প্রাচীন রোমকদিগকে স্বীয় অতুল্য বস্ত্র জোগাইয়াছিল, যাহার বস্ত্র লইয়া যাইবার জন্য রোমক জাহাজ ঢাকায় আসিয়া লাগিত, যে বস্ত্র পারিস নগরে ধনশালিনী বিলাসিনী রমণীদিগের লোভের বস্তু ছিল, যাহার শিশির সম সূক্ষ্মতা সমস্ত জগতে প্রসিদ্ধ ছিল, ঢাকার সেই গৌরব উক্ত পরমিট দ্বারা একেবারে বিনষ্ট হইয়াছিল। রামপ্রসাদ বসু এই পরমিটের দেওয়ান ছিলেন। তিনি বেতনভুক্ চাকর ছিলেন মাত্র, ঢাকাই বস্ত্রবাণিজ্য নাশের কলঙ্ক তাঁহাকে

স্পর্শিতে পারে না। রামপ্রসাদ বসু যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহা সমস্তই দান ধ্যানে ব্যয় করিতেন। বাদলগ্রামের ব্রাহ্মণেরা ঢাকায় গিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিলক্ষণ হাত মারিয়া লইয়া আসিতেন। রামপ্রসাদ বসু স্বর্ণদানে অধিক পুণ্য আছে শাস্ত্রীয় এই বাক্যানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণ অর্থাৎ মোহর দান করিতে বড় ভাল বাসিতেন। খড়ো বাড়ী; স্ত্রীর হাতে রূপার পৈচে, কিন্তু প্রত্যহ বাদলগ্রামের বাটীতে ও ঢাকার বাসায় অনেক লোককে অন্নদান করা হইত। যাহাতে কেবল বাড়ার লোকে ঘি না খাইয়া সকল লোকে ঘি খাইতে পারে এই জন্য পাক করা রাশীকৃত অন্নের উপর একেবারে ঘি ঢালিয়া দেওয়া হইত। সে কালের লোকের বদান্যতা অপরিমিত আকার ধারণ করিত, এবং পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া নিয়োজিত হইত না বটে তথাপি তাহা যে তাঁহাদিগের ঔদার্য্য প্রকাশ করে তাহার সন্দেহ নাই। রামপ্রসাদ বসুর দেওয়ান হইবার অনেক অগ্রে ঢাকার পরমিট সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের উপরে গণিত অভিপ্রায় সংসাধিত হইলে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয়। পরমিট উঠিয়া গেলে কর্ম্ম যাওয়াতে রামপ্রসাদ বসু বাটীতে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কর্ম্ম যাইবার পর তিনি যখন বাদল-গ্রামের বাটীতে থাকিতেন তখন সর্ব্বদাই ঢিলে পাজামা, মেরজাই ও কাবা পরিয়া বসিয়া থাকিতেন। এক্ষণে যেমন

ইংরাজী আচার ব্যবহার ও পরিচ্ছদের অনুকরণ প্রবল, সে কালে সেইরূপ মুসলমানদিগের আচার ব্যবহার ও পরিচ্ছদের অনুকরণ প্রবল ছিল। তখন ঢিলা পাজামা, মেরজাই ও কাবা ব্যবহারের রীতি প্রচলিত ছিল। ঠিক মুসলমান প্রণালীতে প্রস্তুত আহার্য্য বস্তু আহার করা রীতিও প্রচলিত ছিল। বড় মানুষদিগের পাকশালার ঘরের দ্বারে একজন দেড়ে অভিজ্ঞ বাবুর্চি টুলের উপর উপবিষ্ট থাকিয়া ঘরের অভ্যন্তরস্থ ব্রাহ্মণ পাচককে পোলাও, কালিয়া, কাবাব, দম্পোক্ত প্রভৃতি কি প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয় তাহা বলিয়া দিত। রামপ্রসাদ বসুর মুসলমানী পরিচ্ছদের অনুকরণ তাঁহার স্বগ্রামবাসীদিগের ভাল লাগিত না। যেমন অন্য সময়ে তেমনি এই সময়েও বাদলগ্রামে দলাদলির বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। তাঁহার স্বগ্রামবাসী কোন ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "আপনি মুসলমানী পোষাক পরিয়া হিন্দুসমাজের দলাদলি করিবেন তাহা হইতে পারে না, ঢিলে পাজামা ছাড়ুন।" রামপ্রসাদ বসু বিলক্ষণ সাহসী ছিলেন। একবার বাদলগ্রামে বাঘ আইসে। তিনি ও গ্রামের একজন নাপিত দুই জনে লাঠি হাতে করিয়া ঐ বাঘ মারিতে যান। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। বাঘ তাঁহার পিঠে এক থাবা মারে তাহাতে ঘা হয়। সেই ঘায়ে রামপ্রসাদ বসু ছয় মাস কষ্ট পান এবং বাঘের ঘায়ের যে কুৎসিত ঔষধ প্রসিদ্ধ আছে তাহা

লাগাইতেন। পাঠক দেখুন এক্ষণকার লোকে একটা শৃগাল তাড়াইতে সক্ষম হয় না। আর সে কালের লোক কেমন সাহসী ছিল। ছেলেবেলা আমাদিগের বাটীতে দেখিয়াছি লাঠি, সোটা, তলওয়ার, টাঙ্গি ঘরের দেওয়ালের উপর ঝোলান থাকিত, অস্ত্র ব্যবহার নিষেধের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের জাতির যাহা কিছু বীর্য্য ছিল তাহা আমরা হারাইতেছি। ইদানীন্তন রামপ্রসাদ বসুর বিলক্ষণ অর্থ কষ্ট হইয়াছিল। তিনি পাণ্ডুরোগের ঔষধ বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। ঐ সময়ে পাণ্ডুরোগের ঔষধ বিক্রয়ের দরুণ টাকা মাত্র তাঁহার জীবনোপায় ছিল। এক দিন একটা মাত্র টাকা হাতে আছে এমন সময়ে গ্রামের কোন ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, "কল্য আমাদিগের আহার হয় নাই। হাতে কিছু নাই।" তিনি বলিলেন, "আমার হাতে একটী টাকা মাত্র আছে তাহা তুমি লইয়া যাও।" ব্রাহ্মণ তাহা লইতে কোন মতে সম্মত হইলেন না। তিনি জোর করিয়া তাঁহাকে সেই টাকাটী দিলেন কিন্তু বলিয়া দিলেন, "ছোট গিন্নি (তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী) যাহাতে তাহা টের না পান এমন করিয়া লইয়া যাও। সে জানিতে পারিলে আমাকে গালি দিয়া ভূত ছাড়া করিবে। আমার নিজের জন্য কোন ভাবনা করি না, ঈশ্বর আছেন।" এই স্বার্থপরতাপূর্ণ ধর্ম্মশূন্য সভ্যতার কালে এরূপ দানশক্তি ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ভাব কয়টা লোকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়?

রামপ্রসাদ বসু কলিকাতার এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কয়েক ঘণ্টা পরে তাহার হরকরা আসিয়া তাঁহাকে ষোলটী টাকা দিয়া গেল। আমাদিগের দেশে যাঁহারা ধর্ম্ম-সমাজ ও রাজনীতি-সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন তাঁহাদিগের সন্ন্যাসী হওয়া কর্ত্তব্য, অর্থাৎ জীবনোপায় জন্য ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা কর্ত্তব্য। নানকের আদি গ্রন্থে একটী কবিতা আছে তাহা এক্ষণে আমাদিগের সম্পূর্ণরূপে স্মরণ হইতেছে না, তাহার প্রারম্ভে এই কয়েকটী কথা আছে, "কাহারে মন বিতয়ে উদম্।" ঐ কবিতার অর্থ এই যে "কেন হে মন! উপজীবিকা জন্য উদ্বিগ্ন হইতেছ। এই সকল জন্তুদিগকে কে আহার পান দিতেছেন? তাঁহার প্রতি নির্ভর কর।" এ বিষয়ে মহাত্মা খ্রীষ্টের উপদেশ প্রসিদ্ধই আছে। যাহারা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করেন ঈশ্বর তাঁহাদিগকে আহার হইতে বঞ্চিত করেন না। আমরা একটী প্রকৃত ধার্ম্মিক বাঙ্গালী পাদ্রীর কথা জানি। তিনি খ্রীষ্টীয় প্রচার-সভা হইতে অতি অল্পই বেতন পান, অর্থকষ্ট বিলক্ষণ কিন্তু তিনি তাঁহার বন্ধুদিগকে বলেন যে যখনই তাঁহার নিতান্ত অর্থকষ্ট উপস্থিত হয় তখনই বিলাত হইতে কোন কোন সাহেবের নিকট হইতে তাঁহার জন্য হুণ্ডি সম্বলিত পত্র আইসে। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষের জন্য এক্ষণে উপরে উল্লিখিত কতক-

গুলি ত্যাগস্বীকারকারী ঈশ্বরনিষ্ঠ ধর্ম্ম প্রচারকারী সন্ন্যাসী, সমাজ-সংস্কারক সন্ন্যাসী ও রাজনৈতিক সন্ন্যাসী আবশ্যক হইয়াছে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা তিনি এই অভাব শীঘ্র দূর করুন।

রামসুন্দর বসু।

রামসুন্দর বসু রামপ্রসাদ বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সে কালের রীত্যনুসারে রামপ্রসাদ বসু বিদেশে চাকরি করিতেন ও রামসুন্দর বসু বাটীতে থাকিয়া বাটীর কায দেখিতেন। ইনি অতি উদারস্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। বাদলগ্রামবাসীর মধ্যে যাঁহারা কলিকাতায় চাকরী করিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার নূতন বাটী নির্ম্মাণ অথবা পুষ্করিণী খনন আবশ্যক হইত তিনি তাহার তত্ত্বাবধানের ভার রামসুন্দর বসুর প্রতি অর্পণ করিতেন। রামসুন্দর বসু গ্রীষ্ম কালে প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় মধ্যমনারায়ণ তৈল বুকে লাগাইয়া ঐ প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত মজুরদিগকে খাটাইতেন। তাঁহার ধাতু স্বভাবতঃ গরম ছিল, এই জন্য তিনি উক্ত তৈল সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন। তাঁহার এমনি গরম ধাতু ছিল যে শীতকালে একটি ফিন্‌ফিনে চাদর গায়ে দিয়া শীত কাটাইতেন। তিনি বলিতেন উষ্ণ পরিচ্ছদ তাঁহার সহ্য হয় না। গরম ধাতুর লোক হইয়াও তিনি পরের হিতার্থে গ্রীষ্মকালে এরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। তাঁহার একটী নিত্য কর্ম্ম ছিল, প্রত্যহ প্রাতে একটী ছাতা

হাতে করিয়া প্রত্যেক বাটীর কাহার কি অভাব আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেন, তৎপরে কাহাকে চাউল, কাহাকে ডাইল, কাহাকেও বা বস্ত্র পাঠাইয়া দিতেন। গ্রামস্থ লোকের ক্রিয়া কলাপে উপস্থিত থাকিয়া নিজের বাটীর কার্য্যের মত তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি পাণ্ডু-রোগের পৈতৃক ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। ইহাতে বাটীতে অনেক রোগীর সমাগম হইত। সেই সকল রোগী যে কয়দিন বাটীতে থাকিত তিনি সে কয়দিন প্রাণপণে তাহাদিগের শুশ্রূষা করিতেন এমন কি স্বহস্তে শয্যাগত রোগীদিগের মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিতেন। আমরা জানি এক্ষণকার অনেক ইংরাজী সভ্যতাভিমানী ব্যক্তি এই কথা শুনিয়া নাক সিঁটকাইবেন, এমন কি নিজের পিতা মাতা পীড়িত হইলে তাঁহারা তাঁহাদের এরূপ সেবা করিতে ঘৃণা বোধ করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের আদর্শ স্থল ইংরাজ জাতির সম্ভ্রান্ত রমণীরা পর্য্যন্ত এরূপ শুশ্রূষাকে (Nursing the Sick) অতি পবিত্র কার্য্য জ্ঞান করেন। সেই সকল সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিরা দেখুন যে সেকালের তাঁহাদিগের হিসাবে অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ব্যক্তি এ বিষয় তাঁহাদিগের অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ ছিল। যদি সভ্যতা মনুষ্যহৃদয়ের এরূপ উচ্চগুণ সকলের বিলোপ সাধন করে তবে সে সভ্যতায় আবশ্যক কি? রামসুন্দর বসু অতি পুত্রবৎসল ছিলেন। তিনি নিজে স্বহস্তে পাক করিয়া পুত্রদিগকে খাওয়াইতে

বিশেষ আমোদ অনুভব করিতেন। ইংরাজেরা যখন প্রথমে এই দেশ অধিকার করেন তখন পাগলা গারদ ছিল না। স্বগ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার সময় রাস্তায় কোন ক্ষিপ্ত ব্যক্তি দেখিলে রামসুন্দর বসু তাঁহাকে ভুলাইয়া ভালাইয়া নিজ বাটীতে আনিয়া রাখিয়া দিতেন। তাঁহার এক ক্ষমতা ছিল—তিনি পাগল বড় বশ করিতে পারিতেন। এই কার্য্যে তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি সহকারিতা করিত। তিনি পাগল পাইলে বিশেষ আহ্লাদ অনুভব করিতেন। এক দিন তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি একটী পাগল পাইয়াছিলেন। তাহার গা খোলা, কেবল একটী ধুতি পরা। তাহার মাথায় একটী লাল টুপি ছিল এবং তাহাতে গুটি কতক ছোট ছোট ঘুঙুর বাঁধা ছিল। সে বলিত যে "আমার পূর্ব্ব নাম রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ছিল, এক্ষণকার নাম জন এণ্টোনিও পিড্রো (John Antonio Pedro)। আমি লিসবোয়াতে (Lisbon) গিয়াছিলাম।" ইংরাজেরা পোর্তুগালের রাজধানীকে লিস্‌বন্ বলে, কিন্তু পোর্তুগালের লোকেরা লিসবোয়া বলে। বোধ হয় এই ব্যক্তি কোন পোর্তুগিজ বণিকের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপন করিয়া তাহার জাহাজে লিসবন্ নগরে গিয়াছিল। রামমোহন রায়ের বিলাত যাইবার পূর্ব্বে কোন কোন বাঙ্গালী এইরূপে তথায় গিয়াছিলেন। ইয়োরোপীয় জাতিগণের মধ্যে পোর্তুগিজেরাই বঙ্গদেশের

সহিত প্রথম বাণিজ্য সম্বন্ধ সংস্থাপন করে। কালীঘাটের পাশ দিয়া যে গঙ্গা গিয়াছে তাহাকে আত্ত গঙ্গা বলে। ঐ আত্ত গঙ্গা এক সময়ে অতি প্রশস্ত নদী ছিল। ঐ নদী দিয়া পোর্তুগিজদিগের জাহাজ আসিয়া গঙ্গায় পড়িয়া শিবপুরের কাছ দিয়া যে সরস্বতী নদী প্রবাহিত আছে এবং যাহা এক্ষণে সাঁকরাইলের খাল নামে আখ্যাত এবং আঁতুল গ্রামের নিকট দিয়া গিয়াছে তাহার মধ্য দিয়া হুগলীর নিকটস্থিত সাতগা গ্রামে যাইত, উলুবেড়িয়ার গাঙ্ দিয়া সরস্বতী নদীর মুখ পর্য্যন্ত আসিতে পারিত না, যেহেতু খিদিরপুর হইতে রাজগঞ্জ পর্য্যন্ত ভূমি ছিল। একজন ধনাঢ্য মোগল খিদিরপুর হইতে রাজগঞ্জ পর্য্যন্ত একটী খাল কাটিয়া দিয়াছিল, সেই খাল ক্রমে প্রশস্ত হইয়া উলুবেড়িয়ার গাঙের সঙ্গে গঙ্গার সংযোগ করিয়া দিয়াছে। খিদিরপুর হইতে জয়নগর মজিলপুর পর্য্যন্ত আত্তগঙ্গার দুই পার্শ্বের গ্রামের নাম প্রাচীন পোর্তুগিজ মানচিত্রে দৃষ্ট হয়। এক্ষণে আত্তগঙ্গা বহুল স্থানে মজিয়া গিয়াছে। কলিকাতার দক্ষিণ দেশের লোকেরা "বসু পুষ্করিণী" "ঘোষের পুষ্করিণী" নামক পুষ্করিণী সকলে গঙ্গা ধরিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গাকে লোকে যেমন পবিত্র জ্ঞান করে সেই সকল পুষ্করিণীকে তাহারা তদনুরূপ পবিত্র জ্ঞান করে। ইংরাজের আমলের প্রথম পর্য্যন্ত পোর্তুগিজদিগের জাহাজ বাণিজ্যার্থে কলিকাতায় আসিত। কলিকাতার শেঠেরা ঐ জাহাজের

কাপ্তেনের কাজ করিয়া বড় মানুষ হইয়াছিলেন। যোড়াসাঁকোর কমল বসু নামক কোন ব্যক্তি পোর্তুগিজ কাপ্তেনের কাজ করাতে তাঁহাকে ফিরিঙ্গি কমল বসু বলিয়া লোকে ডাকিত। কামরা প্রভৃতি দুই একটী পোর্তুগিজ শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে।

রামসুন্দর বসু উল্লিখিত রূপে নিজে গ্রামের অনেক অনেক উপকার সাধন করিয়া ইংরাজী ১৮২৪ সালে গতাসু হয়েন। ঐ শালে বঙ্গদেশে ওলাউঠায় বড় মড়ক হয়। এই মড়কের সময় বাদল গ্রামের কতকগুলি ষণ্ডার প্রত্যহ খিচুড়ি ও পাঁঠা খাইবার ধুম লাগিয়াছিল। সে সকল ষণ্ডারা অক্ষতশরীরে মড়ক হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। আর যাহারা পরিমিতাহারী ছিল তাহাদিগের মধ্যে অনেকে কালগ্রাসে পতিত হইল। কিন্তু তাহাদিগের ন্যায় ডাংপিঠে লোকের দৃষ্টান্ত সাধারণের অনুকরণীয় হইতে পারে না। রামসুন্দর বসু আহারের বিষয়ে অতি সাবধান ছিলেন। দুই বেলা মুগের ডাল ও মাছের ঝোল ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন আহারীয় বস্তু সহ্য হইত না। গ্রামে ওলাউঠার মড়ক দুই এক মাস স্থগিত হইয়াছে এমন সময়ে বৃদ্ধের কিরূপ কুমতি গেল, তিনি অল্প পরিমাণে অরহর দাল ও কাঁকড়া খাইলেন; তাহাতেই তাঁহার ঐ রোগের উৎপত্তি হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি মরিবার সময় এই উপদেশ দিয়াছিলেন;—"আমাদিগের বংশে কেহ যেন অরহর দাল

ও কাঁকড়া না খায়।” কিন্তু রামসুন্দর বসুর পৌত্র ভূত-পূর্ব্ব হিন্দু কলেজের ছাত্র রামনারায়ণ বসু বাল্যকালে আমাদিগের সঙ্গে পুষ্করিণী হইতে দশরথ ধরিয়া তাহা পোড়াইয়া তাহাতে নুন তেল মাখিয়া খাইয়া তাঁহার পিতামহের আদেশ কতবার লঙ্ঘন করিয়া বৃদ্ধের প্রেতাত্মাকে কষ্ট দিয়াছেন তাহা বলা যায় না। রামসুন্দর বসু ভগবদ্গীতা বাঙ্গলা গদ্যে অনুবাদ করেন। সংস্কৃত মূল সহ সেই অনুবাদ রামনারায়ণ বাবুর নিকট এখনও আছে। ইংরাজেরা যেমন বাইবেলে আপনার সন্তানদিগের জন্মদিবস লিখিয়া রাখেন, তিনি সেইরূপ ঐ ভগবদ্গীতাতে আপনার সন্তানদিগের জন্মদিবস লিখিয়া রাখিয়াছেন। রামপ্রসাদ বসু ও রামসুন্দর বসুর নাম এখন পর্য্যন্ত বাদল গ্রামে অতি প্রসিদ্ধ। বাদল গ্রামের লোকে ঐ দুই জনকে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি জ্ঞান করে।

মধুসূদন বসু।

রামসুন্দর বসুর দুই সংসার। তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে মধুসূদন বসু জন্ম গ্রহণ করেন। মধুসূদন বসু পাঠকবর্গের পরিচিত রামনারায়ণ বাবুর জেঠা। রামনারায়ণ বাবু যখন নিতান্ত বালক তখন মধুসূদন বসু তাঁহাকে হাঁটুর উপর বসাইয়া “মা নিষাদ” এই প্রয়োগাদ্য শ্লোক অভ্যাস করাইতেন। সে কালে বালকদিগকে সংস্কৃত শ্লোক অভ্যাস করাইবার রীতি ছিল। বাপ খুড়ো জেঠা

প্রভৃতি গুরুজনেরা তাহাদিগকে ঐ সকল শ্লোক অভ্যাস করাইতেন। যে শ্লোকের আদিতে "মা নিষাদ" আছে সেই চিরবিখ্যাত শ্লোক সর্ব্বপ্রথমে মুখস্থ করাইতেন। এ রীতিটী কেন উঠিয়া গেল আমরা বুঝিতে পারি না। যে শ্লোকটী সংস্কৃত ইতিহাস পুরাণ ও উপপুরাণের ভিত্তি স্বরূপ, যে সকল অনুষ্টুপ শ্লোক দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যরূপ বৃহৎ ও সুশোভন অট্টালিকার অধিকাংশ বিরচিত, তাহার মধ্যে যেটী সর্ব্বপ্রথম রচিত হয়, যাহা রামায়ণে ঐ ছন্দের অন্যান্য শ্লোকের মধ্যে পবিত্র স্বভাব মহর্ষি বাল্মীকির পবিত্র রসনা হইতে দেব প্রেরণা প্রভাবে প্রথমে বিনিঃসৃত হইয়া নিজ শ্লোক রচয়িতাকেও বিস্মিত করিয়াছিল, যে ছন্দের শ্লোকে অবনীমণ্ডল পবিত্রকারী পুণ্য গাথা রামায়ণ বিরচিত, যে শ্লোক জীবের প্রতি কারুণ্যরসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক, সে শ্লোক যদি অগ্রে বালকদিগকে কণ্ঠস্থ করান উচিত না হয়, তবে কোন শ্লোক করান উচিত? রোগের সময়ে খই খাইবার প্রথা যেমন বিনা কারণে উঠিয়া গিয়া সাগু খাইবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তেমনি বিনা কারণে "মা নিষাদ" কণ্ঠস্থ করাইবার রীতি উঠিয়া গিয়াছে। খই অতি শুভ্র পবিত্র লঘুপাক দ্রব্য, তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া সাগু তাহার স্থান কেন অধিকার করিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সেই "মা নিষাদ" বালকদিগকে কণ্ঠস্থ করাইবার রীতি

কেন উঠিয়া গেল বুঝিতে পারি না। "মা নিষাদ" প্রয়োগাদ্য শ্লোকটী হিন্দুজাতির একটী কীৰ্ত্তিস্তম্ভ ও উচ্চ জাতীয় স্বভাবের মহত্ত্বের পরিচায়ক। সেই শ্লোক কণ্ঠস্থ না করান পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। প্রাচীন কালে গ্রীসদেশের লোকেরা যেমন থিওগিনস্ (Theoginus) কবি রচিত নীতিসূত্র বালকদিগকে অভ্যাস করাইত তেমনি সে কালে আমাদিগের দেশে গুরুজনেরা বালকদিগকে চাণক্য শ্লোক অভ্যাস করাইতেন। মধুসূদন বসুজা মহাশয় রামনারায়ণ বাবুকে হাঁটুর উপর বসাইয়া চাণক্যের শ্লোকও অভ্যাস করাইতেন। বালকদিগকে হিতোপদেশগর্ভ কবিতা অভ্যাস করান অতি উত্তম রীতি। দেখা যায় মনুষ্যের বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর সংসার পথে বিচরণ করিবার সময় তাঁহার বিদ্যালয়ে কণ্ঠস্থ করা পদ্যময় হিতোপদেশ অনেক সময়ে তাঁহার সাংসারিক কার্য্য নিয়মিত করে। চাণক্য শ্লোকে অনেক হিতোপদেশ আছে। বালকদিগকে তাহা অভ্যাস করান উত্তম রীতি বলিতে হইবেক। বালকদিগকে তাহা অভ্যাস করাইবার রীতি কেন উঠিয়া গেল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। নিদান পক্ষে বাঙ্গালা ভাষায় ঐ প্রকার নীতিসূত্র বিরচিত হইবার পূর্ব্বে ঐ রীতি উঠাইয়া দেওয়া ভাল কায হয় নাই। মধুসূদন বসু সে কালের রীত্যনুসারে রামনারায়ণ বাবুকে ইংরাজী শব্দের মর্ম্মও অভ্যাস করাইতেন যথা, গড, ঈশ্বর; লার্ড ঈশ্বর; আই, আমি;

ইউ, তুমি ; গো, যাও ; কম, আইস। সে কালে বালক-দিগকে ইংরাজী শব্দের অর্থ শিখাইবার সময় গুরুজনেরা অনেক ভুল অর্থ শিখাইতেন; যথা, Plum, কুল; Apple, আতা; Wood-apple, বেল; Black berry, কালজাম; Thrush, ছাতারে পক্ষী ; Nightingale, বুলবুল ; Can, বাটি ; Basin, কড়া ; Dish, রেকাব। অন্য দেশের পদার্থ সকল আমাদিগের দেশীয় সেই জাতীয় পদার্থের ন্যায় অবিকল ঠিক নহে, অতএব সেই সকল পদার্থের তদ্দেশীয় নামের অর্থ শিখিবার সময় অনেক ভুল শিখিবার সম্ভাবনা। ইহা বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা সংঘটিত একটি বিষম অসুবিধা বলিতে হইবে। আমরা উচ্চ শিক্ষার অতিশয় পক্ষপাতী। আমাদিগের এই বিশ্বাস যে উচ্চশিক্ষা রহিত হইলে দেশের বহুল অনিষ্ট সাধিত হইবে, তথাপি আমরা ইংরাজী শিক্ষার দোষের প্রতি অন্ধ নহি। ইংরাজী ভাষা অতি শ্রুতিকটু। ইংরাজী ভাষা ইংরাজী পরিচ্ছদের ন্যায় কঠোর। ইংরাজেরা তাঁহাদিগের খোদিত পাষাণময় মূর্তিকে হ্যাট কোট কখন পরান না। সেই সকল মূর্ত্তিকে এক প্রকার ঢলঢলে পোষাক পরাইয়া দেন। অতএব ইংরাজেরা যে আপনাদিগের পরিচ্ছদকে কঠোর পরিচ্ছদ জ্ঞান করেন তাহা এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। তাহা-দিগের পরিচ্ছদ যেমন কঠোর ভাষাও তেমনি কঠোর। ইংরাজীর ন্যায় শ্রুতিকটু ভাষা আমাদিগকে পড়িতে হয়,

ইহা সুখদায়ক কার্য্য বলা যাইতে পারে না। ইংরাজীতে উচ্চারণের কোন নিয়ম নাই। Cholmondeley শব্দ ঠিক বানান অনুসারে উচ্চারণ করিতে গেলে "চলমণ্ডলি" হয়, কিন্তু উহার প্রকৃত উচ্চারণ চমলি। St. Omar বানান অনুসারে উচ্চারণ করিতে হইলে সেণ্ট ওমার হয়, কিন্তু উহার প্রকৃত উচ্চারণ "সামার"। "Yacht" শব্দ ঠিক বানান অনুসারে উচ্চারণ করিতে গেলে ইয়াচট্ হয়, কিন্তু উচ্চারণ ইয়ট্। ইংরাজী উচ্চারণের এত গোলমাল যে ইংরাজী শিক্ষার্থীদিগের আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হয়। পূর্ব্ব জন্মের অনেক পাপ না থাকিলে আমাদিগকে এরূপ ভাষা পাঠ করিতে বাধ্য হইতে হইত না। ইংরাজী প্রথম শিখিবার সময় ইংরাজী অনেক শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্যক-রূপে বালকগণ বুঝিতে সক্ষম হয় না। যখন বয়স বৃদ্ধি হয় তখন সেই সকল শব্দের প্রকৃত অর্থ তাহাদিগের মনে প্রতিভাত হয়। এই সকল অসুবিধা ব্যতীত ইংরাজী শিক্ষার অন্যান্য অসুবিধা আছে। মনে কর একজন পাঁচ বছর বয়সের সময় ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার বয়স ষাট বৎসর। পঞ্চান্ন বৎসর ইংরাজী পড়িয়াও কোন কোন প্রয়োগ ব্যবহার করিবার সময় সে প্রয়োগ ইংরাজী রীতিসম্মত কি না সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হয়। ইহা কম বিড়ম্বনা নহে। ইহার উপর আবার আমাদিগের দুরাকাঙ্ক্ষা যে ইংরাজের ন্যায়

ইংরাজীভাষা কহিতে ও লিখিতে পারিব। ইংরাজের ন্যায় ইংরাজী কহিতে ও লিখিতে পারিবার জন্য আমরা কত কষ্ট স্বীকার না করি। কেন রে বাপু! কি দায় পড়িয়া গিয়াছে? কিন্তু না করিলেও নয়। আমাদিগের কোন বন্ধু ইংরাজী বিলক্ষণ জানেন, তথাপি তাঁহার কখন কখন ইংরাজী উচ্চারণ করিবার বা লিখিবার সময় ভুল হয়। তাঁহার কোন ইংরাজ বন্ধু সেই ভুল ধরিলে তিনি তাহাতে লজ্জিত না হইয়া অম্লানবদনে বলেন, "It is a language foreign to me." এ বিষয়ে তাঁহার নির্লজ্জতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। ইংরাজী ভাষা সামান্যরূপে আয়ত্ত করিতে প্রায় আমাদিগের বিশ বৎসর লাগে। একটা ভাষা সামান্যরূপে শিখিতে বিশ বৎসর! কি ভয়ানক কথা! বাঙ্গালী সচরাচর হদ্দ চল্লিশ বৎসর বাঁচে। তাহার অৰ্দ্ধেক জীবন যদি একটা বিদেশীয় ভাষা শিখিতে গেল, তবে আর কি হইল? আমাদিগের মাতৃভাষা যদি সেরূপ সম্পন্নশালিনী হইত তাহা হইলে এই বিশ বৎসরে কেবল সেই ভাষার পুস্তক পাঠ করিলে আমরা কতই শিখিতাম তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এতদ্ব্যতীত যখন বিবেচনা করা যায় যে ইংরাজীভাষা অধ্যয়ন জন্য আমরা শারীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া চিররোগী হইয়া পড়িতেছি, তখন ইংরাজী ভাষার শিক্ষার প্রতি বিশেষ বিরাগ জন্মে।

ইংরাজীভাষায় সম্পাদিত এ দেশীয় কোন সংবাদপত্র সম্পাদক বলিয়াছেন ;—

" Why and how it is we know not, but it is a fact, that with his Mohabharat and Subhunkar, his coarse Dhuti and clumsy slippers, the old venerable looking Brahmin of Bhatpara was a healthy, strong and stout specimen of humanity, but the modern Baboo with his Shakespeare and Milton, his china-coat and tight boots his Municipality and Bahadurship, is a sorry, shrunken creature, a fit illustration of dyspepsia, whose income only goes to fatten the doctor and the druggist. The Nuddea Pandit in days gone by used to eat voraciously both smriti and luchis, doing justice to both and proving beyond a doubt that his stomach was as capacious as his brain and his muscles as vigorous as his intellect. But look at those Lilliputian bipeds, crawling out of the Senate-house after passing matriculation examination, looking as if they had meant to go to the adjoining Hospital, but had by mistake entered the Senate house. The greater the civilization and academic culture, the more emaciated and sickly looks the product of our university."*

"কেন এবং কি কারণে এইরূপ হইয়াছে আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু কেহই অস্বীকার করিবেন না যে সে কালের মহাভারত ও শুভঙ্কর অধ্যায়ী, মোটা ধুতি ও ধূলিপূর্ণ চটিজুতা পরিধায়ী, ভাটপাড়ার শ্রদ্ধাভাজন

* Indian Mirror, Sunday Edition. 15th December —1878.

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সুস্থকায়, দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু আজকালের সেক্‌সপিয়ার ও মিলটন অধ্যায়ী, চায়নাকোট ও বুট পরিধায়ী, মিউনিসিপাল ওয়ালা, বাহাদুর উপাধিধারী বাবুরা অতি অপদার্থ জীব, দেখিতে কৃশকায়, এক একজন যেন অজীর্ণতার অবতার, তাঁহাদের যাহা কিছু আয় হয় তাহা ডাক্তার ও ঔষধ বিক্রেতার উদর পূরণে ব্যয়িত হয়। সে কালের নদীয়ার পণ্ডিতেরা যেমন প্রচুরপরিমাণে স্মৃতি আহার করিতে পারিতেন, তেমনি রাশিকৃত লুচিও খাইতে পারিতেন! উভয়েরই প্রতি তাঁহারা সমান সুবিচার করিতেন। ইহা দ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হয় যে তাঁহাদের উদরটী যেমন ফলাও, মস্তিষ্কও তেমন প্রশস্ত ছিল, এবং তাঁহাদের শরীর যেমন বলিষ্ঠ, বুদ্ধিশক্তিও তেমনি তেজস্বী ছিল। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া সেনেট হাউস হইতে ঐ যে লিলিপট্‌বাসীদিগের ন্যায় খর্ব্বকায় দ্বিপদ জাবগুলি বাহির হইয়া আসিতেছে উহা-দিগের প্রতি একবার চাহিয়া দেখ। উহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন উহারা পার্শ্বস্থ হাঁসপাতালে যাইবার মনস্থ করিয়াছিল, ভ্রমক্রমে সেনেট হাউসে প্রবেশ করিয়াছে। যতই শিক্ষা ও সভ্যতার বৃদ্ধি হইতেছে, ততই আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়-প্রসূত ছাত্রগণ রুগ্ন ও কৃশতনু হইয়া যাইতেছে।"

মধুসূদন বসুজা মহাশয় উদোমাদা লোক ছিলেন। একদা তাঁহার কোন পীড়া হওয়াতে তাঁহার কোন বন্ধু

তাঁহাকে বিহিদানা খাইতে বলেন। বাদল গ্রামের নিকট গড়াইগ্রামে অনেকগুলি দোকান আছে, উহা একটী গঞ্জ বিশেষ স্থান। ঐ স্থানে সপ্তাহে একটী নির্দ্দিষ্ট দিবসে হাট হইয়া থাকে। মধুসূদন বসু গড়াইয়া বেণের দোকানে বিহিদানা ক্রয় করিবার মানসে তথায় যাত্রা করিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে বিহিদানা ভুলিয়া গেলেন, বেণের দোকানে গিয়া বিহিদানা নামটী না চাহিয়া মিহিদানা চাহিলেন। পাঠকবর্গ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন বেণেরা কোন খোদ্দেরকে ফিরায় না। কোন ঔষধের দ্রব্য না থাকিলেও অন্য কোন দ্রব্য সেই দ্রব্য বলিয়া দেয়। মিহিদানা বলাতে বেণিয়া তাহাকে অতি সূক্ষ্ম এক প্রকার দানা দিল। বসুজা মহাশয় তাহাই লইয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহার যে বন্ধু বিহিদানা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাকে উহা খাইতে নিষেধ করিলেন। আমরা যে সকল ঔষধ বেণের দোকান হইতে ক্রয় করি তাহা আমাদিগের অপরিচিত থাকিলে বিলক্ষণরূপে তাহা যাচাই করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে বিহিদানা পরিবর্ত্তে মিহিদানা খাইবার অনিষ্ট ভোগ করিতে হয়।

আনন্দকিশোর বসু।

আনন্দকিশোর বসু রামসুন্দর বসুর দ্বিতীয় পত্নীর প্রথম সন্তান। ইনি রামমোহন রায়ের স্কুলে পড়েন। হিন্দুকলেজ সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে রামমোহন রায় স্বদেশীয়

লোকদিগকে ইংরাজী শিখাইবার জন্য এক স্কুল সংস্থাপন করেন। ঐ স্কুল কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীতে সংস্থিত ছিল। ইহা "পূর্ণ মিত্রের স্কুল" নামে পশ্চাৎ খ্যাত হয়। আনন্দ বাবু ফুট ফুটে ও বুদ্ধিমান্ বালক ছিলেন। তাঁহার পঠদ্দশা হইতেই রামমোহন রায়ের স্নেহদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। ইনি স্কুল ছাড়িয়া দিন কয়েক রামমোহন রায়ের কেরাণীগিরি করেন। ইহাকে রামমোহন রায় যে সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন তাহা আমরা আনন্দ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণ বাবুর নিকট দেখিয়াছি। রামমোহন রায় যে তেজস্বী পুরুষ ছিলেন তাহা তাঁহার হস্তলিপি পর্য্যন্ত প্রমাণ করিতেছে। হাতের লেখা দ্বারা মনুষ্যের স্বভাব অনেক অনুমান করা যায়। আনন্দ বাবুর স্ত্রী দেখিতে তত ভাল ছিলেন না। যখন তাঁহার শ্বশুর বিবাহের পূর্ব্বে মেয়ে দেখান তখন আপনার কন্যাকে না দেখাইয়া পাড়ার একটি সুন্দরী বালিকাকে দেখান। আনন্দ বাবু বিবাহের পর এই জুয়াচুরী টের পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার স্ত্রীকে সপত্নী দেখাইবার মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায় তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে নিষেধ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে বৃক্ষের উৎকর্ষ ফলের উৎকৃষ্টতা দ্বারা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এই স্ত্রী দ্বারা যদি তোমার ভাল সন্তান হয় তাহা হইলে এই স্ত্রীকেই অতি সুন্দরী জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। আনন্দ বাবুর পুত্র রামনারায়ণ

বাবুর নাম ব্রাহ্মমহল ছাড়া সাধারণবর্গ জানে না, আর ব্রাহ্মমহলেও তাঁহার খ্যাতি তত বেশী নহে। তথাপি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটি গণ্য ব্যক্তি হইয়া তিনি রামমোহন রায়ের ভবিষ্যদ্বাণী যে কিয়ৎপরিমাণে সার্থক করিয়াছেন ইহাতে আমরা আহ্লাদিত আছি। আনন্দ বাবু রামমোহন রায়ের কেরাণীগিরি পদ ছাড়িয়া "হরকরা" আফিসে কেরাণীগিরি করেন। এই "হরকরা" পত্র এক্ষণে ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজের সহিত একীভূত হইয়াছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে উহা একটী অতি প্রসিদ্ধ কাগজ ছিল। সেকালের ইংরাজী কবি নন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত Golden Moon নামক কবিতা পুস্তকের এক স্থানে লিখিয়াছিলেন, "Englishman wife, Hurkeru husband." Englishmanএর কলম তখন জোর কলম ছিল না, Hurkeruর জোর কলম ছিল। আমাদিগের কোন বিখ্যাত বন্ধু খবরের কাগজ আদৌ পড়েন না। তিনি বলেন উহা রাতকাণার গল্পে পরিপূর্ণ। একবার আমরা কোন খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম যে একটী কিছু কিছু স্ত্রীচিহ্নবিশিষ্ট ক্লীব ক্রমে ক্রমে পুরুষে পরিণত হইয়া পরিশেষে সৈনিক দলে প্রবেশ করে। Englishman কাগজের সেই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এক্ষণে তিনি কেবল পুরুষ হইয়াছেন এমন নহে; পুরুষত্বের বাড়াবাড়ি করিতেছেন, তাঁহাকে উপযুক্ত

পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য। আনন্দকিশোর বাবু হরকরা আফিসের কেরাণীগিরির পরে অন্য অনেক স্থানে কেরাণী-গিরি করিয়া, গাজীপুরের আফিঙের এজেণ্টের আফিসে কার্য্য করেন। তখন John Frotter ওপিয়ম এজেণ্ট ছিলেন। গাজীপুরে অবস্থিতি কালে একদিন আনন্দ বাবুর শরীর অসুস্থ হওয়াতে তথাকার ডাক্তার সাহেব এমন একটী জোলাপ দেন যে অসংখ্য দাস্ত হয়। সেই অবধি আনন্দ বাবুর শরীর এমনি ভগ্ন হয় যে তিনি চিররোগী হইয়া পড়েন। সে কালে ডাক্তারদিগের মধ্যে দাস্ত খোলা, জোঁক লাগানো, খুব জোলাপ দেওয়া, কেলোমেল খাওয়ান রীতি অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। এক্ষণে সেরূপ দেখা যায় না। সেকালে ডাক্তারেরা রোগীকে যে কত ঔষধ গেলাইতেন তাহা বলা যায় না। যে সকল রোগী এই বীরোচিত চিকিৎসায় বাঁচিয়া যাইত তাহাদিগকে ভাগ্যবান বলিতে হইবে। এক্ষণে এইরূপ শুভ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে কোন কোন এলোপেথিক ডাক্তার পর্য্যন্ত এলোপেথিক ঔষধ অতি অল্প পরিমাণে, এমন কি প্রায় হোমিওপেথিক পরিমাণে দিয়া থাকেন। আনন্দ বাবু গাজীপুর হইতে ফিরিয়া কলিকাতার অনেক স্থানে কেরাণীগিরি করিয়া পরিশেষে খাস কমিসনের হেড কেরাণী পদে নিযুক্ত হয়েন। এই খাস কমিসন ব্রহ্মোত্তর জমী বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত হয়। এই খাস কমিসনে আনন্দ

বাবু যেরূপ কাজ করিতেন তাহা এক্ষণে কোন কোন আফিসের রেজিষ্ট্রারের উপযুক্ত। কিন্তু তিনি তাঁহার কার্য্যের উপযুক্ত বেতন পাইতেন না। মনে করিলে তিনি এই কর্ম্মে অনেক ঘুষ খাইয়া বড় মানুষ হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি ঘুষ খাইতেন না; তিনি বড় সৎপ্রকৃতির লোক ছিলেন। আনন্দকিশোর বাবু ইংরাজী বেশ লিখিতে পারিতেন কিন্তু ইংরাজী ভাল উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। তিনি "to" শব্দ উচ্চারণ না করিয়া "টো" উচ্চারণ করিতেন। তাঁহার পুত্র রামনারায়ণ বাবু হিন্দু কলেজের একটী বিখ্যাত ছাত্র। তিনি পিতার মৃত্যুর পর তদানীন্তন সুপ্রিম কাউন্সিলের লেজিস্লেটিব মেম্বর Hon'ble C. H. Cameron সাহেবের নিকট হইতে তখনকার বেঙ্গল সেক্রেটারী Halliday সাহেবের নামে একটী অনুরোধ পত্র লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই হালিডে সাহেব পরে বঙ্গদেশের লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হয়েন। হালিডে সাহেব রামনারায়ণ বাবুকে তাঁহার পিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে এবং রামনারায়ণ বাবু তাহা বলাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "That Ananda Kishore who used to write English so well" "সেই আনন্দকিশোর যিনি ইংরাজী ভাল লিখিতে পারিতেন?" আনন্দকিশোর বসু পারস্য ভাষাও বিলক্ষণ জানিতেন। তখন আদালতের কার্য্য পারস্য ভাষায়

সম্পাদিত হইত। এক্ষণে যেমন বাঙ্গালার সঙ্গে ইংরাজী শব্দ মিশাইয়া কথা কহিবার রীতি প্রচলিত, আনন্দকিশোর বসুর সময়ে বিদ্বান ব্যক্তিদিগের মধ্যে বাঙ্গালার সঙ্গে পারস্য শব্দ মিশাইয়া কথা কহিবার রীতি প্রচলিত ছিল। আমাদিগের জীবদ্দশাতে ক্রমে ক্রমে আমাদিগের অজ্ঞাতসারে পারসী মিশ্রণ রীতি রহিত হইয়া ইংরাজী মিশ্রণ রীতি প্রচলিত হইল। এক্ষণকার লোকে যেমন বলে "এ জিনিষটা nourishing" তখনকার লোকে বলিত এ জিনিষটা বড় "মকব্বি"। আনন্দ বাবু আপনার বিদ্যা ও কার্য্য-নৈপুণ্য দ্বারা তাঁহার সাহেব প্রভুদিগকে অতিশয় সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে আমরা একটী দাঁড়াডেস্কের নিকট দাঁড়াইয়া দিবারাত্রি কাজ করিতে দেখিয়াছি। আফিসের কাগজ বাটীতে লইয়া আসিয়া কাজ করিতেন। দাঁড়াইয়া লিখিতে ডাক্তার তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিল। তিনি ১৬০৲ টাকা বেতন পাইতেন, এতদ্ব্যতীত লোকের কাগজ পত্র তরজমা করিয়া মাসে প্রায় চল্লিশ টাকা রোজগার করিতেন। তখনকার এই দুই শত টাকা এখনকার ছয় শত টাকার সমান। তখন জিনিসপত্র এত সস্তা ছিল যে তিনি এই দুই শত টাকাতে দিব্য সম্পন্ন মানুষের ন্যায় কাটাইতেন। তাঁহার আয়ের বিশিষ্ট অংশ পরোপকারে ব্যয়িত হইত। ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথমে

আনন্দ বাবুর জ্বরবিকার হয়। পীড়াক্রান্ত হইয়া বাদল-গ্রামের বাটীতে আইসেন, তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

আনন্দকিশোর বাবু রামমোহন রায়ের শিষ্য ছিলেন। সে কালের ব্রাহ্মদিগের কিরূপ ধর্ম্মমত ছিল পাঠকবর্গ সে বিষয়ে কৌতূহলাক্রান্ত হইতে পারেন। আনন্দকিশোর বাবু বৈদান্তিক ছিলেন। জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ, জগৎ স্বপ্নবৎ, নির্ব্বাণ মুক্তি এই সকল মতে বিশ্বাস করিতেন। একদিন তিনি, রামনারায়ণ বাবু ও কলিকাতা সিমুলিয়া নিবাসী পরম বৈষ্ণব নন্দলাল বাবু এই তিন জনে বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছিলেন। রামনারায়ণ বাবু তখন হিন্দু কালেজে পড়েন। নির্ব্বাণ মুক্তির বিষয়ে কথা হইতেছিল। আনন্দকিশোর বাবু নির্ব্বাণ মুক্তি মত সমর্থন করিতেছিলেন। নন্দলাল বাবু বিদায় হইয়া সিঁড়িতে নামিবার সময় রামনারায়ণ বাবুকে চুপি চুপি বলিলেন, "বাপু! তোমার বাবার মতে তুমি বিশ্বাস করিও না; দেখ চিনি হবার চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল।" মৃত্যুসময়ে যখন আনন্দ বাবু তাঁহার গ্রামের আস্থ গঙ্গার ঘাটে নীত হয়েন, তখন তাঁহার পরম বন্ধু ভূতপূর্ব্ব দারোগা শ্যামচাঁদ ঘোষ তাঁহার নিকট শঙ্কর ভাষ্য পাঠ করিতে লাগিলেন। আনন্দ বাবু প্রণব জপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পর দৃষ্ট হইল অঙ্গুলির উপর অঙ্গুলি রহিয়াছে। আনন্দ বাবু হাফেজ, জেলালুদ্দীন রুমি প্রভৃতি সুফী সম্প্রদায়স্থ

পারস্য কবির কবিতা আবৃত্তি করিতে বড় ভাল বাসিতেন। পাঠকবর্গ অবশ্য জ্ঞাত আছেন যে বৈদান্তিক ও সুফীদিগের মতের পরস্পর অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু আনন্দ বাবু নিজের ধর্ম্মমত "Universal Religion" অর্থাৎ বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিতেন আর ভাবে গদগদ হইতেন। যখন "Universal Religion" বলিতেন তখন তদ্দারা বৈদান্তিক মত যে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বুঝাইতেন এমন বোধ হয় না। একমাত্র নিরাকার অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে বিশ্বাস সকল ধর্ম্মের মূলে আছে ঐ বাক্য দ্বারা ইহাই কেবল বুঝাইতেন সন্দেহ নাই। আনন্দ বাবু ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে অতিশয় শিথিলতা প্রকাশ করিতেন। আনন্দ বাবু বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তৎপরে রামনারায়ণ বাবুও তাহা করা ছাড়িয়া দিলেন। তৎপরে তাহা করিবার ভার বংশের একটী নিতান্ত বালক মধুসূদন বসুর পুত্রের উপর গিয়া পড়িল। এই জন্য ঐ বালককে আনন্দ বাবুর সহধর্ম্মিণী বলিতেন "তুই আমাদের বংশধর, আর সকলে বয়ে গিয়েছে, তুই কেবল বংশের নাম রাখিবি।" আনন্দ বাবু আহার বিষয়ে জাতিভেদের বিচার করিতেন না। খানা খাওয়ার একটী স্রোত রামমোহন রায় হইতে বাহির হয়, আর একটী স্রোত ডিরোজিওর শিষ্যদিগের নিকট হইতে বাহির হয়, উভয় স্রোত পরস্পর মিলিত হইয়া পরে প্রবলবেগে হিন্দু সমাজে

প্রবাহিত হয়। কিন্তু রামমোহন রায়ের শিষ্যেরা ইংরাজীতর আহার ভাল বাসিতেন না; তাঁহারা মুসলমানীতর আহার ভাল বাসিতেন। একদা আনন্দ বাবু রামনারায়ণ বাবুর পরম বন্ধু হিন্দু কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক শ্যামতনু বাবুকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে পোলাও কালিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করাইয়া খাওয়ান। শ্যামতনু বাবু তাহা খাইবার সময় বলিয়াছিলেন, "It is too rich" অর্থাৎ ইহা বড় ঘিওয়ালা। ইহাতে আনন্দ বাবু আপনার পুত্রের বন্ধুর প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "বাবু ইংরাজ হয়েছেন।" শ্যামতনু বাবু ডিরোজিওর শিষ্য। তিনি এখনও জীবিত আছেন। রামনারায়ণ বাবু স্বপ্নেও জানিতেন না যে তাঁহার পিতার যবন স্পৃষ্ট আহার চলে। তিনি মনে করিতেন আমরা কালেজের ছোকরা, আমাদিগেরই ঐরূপ আহার চলে। তিনি কখন মনে করেন নাই যে তাঁহার পিতা এত অগ্রসর। আনন্দ বাবুর বাসা তখন পটলডাঙ্গায় ছিল। রামনারায়ণ বাবু পাড়ার পরমেশ্বর ঘোষাল, প্রসন্নকুমার সেন, আনন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সহিত কালেজের গোলদিঘিতে মদ খাইতেন এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে সেখানে কতকগুলি গোমাংসের শিক কাবাবের দোকান ছিল, তথা হইতে উক্ত কাবাব কিনিয়া আনিয়া আহার করিতেন। তিনি ও তাঁহার সহচরেরা এইরূপ গোমাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি

খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শক কার্য্য মনে করিতেন। একদা রামনারায়ণ বাবু গোলদিঘিতে মদ খাইয়া টুপভুজুঙ্গ হইয়া রাত্রিতে বাটীতে আসাতে তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি আর কলিকাতার বাসায় থাকিব না, বাদলগ্রামের বাটীতে গিয়া থাকিব।" আনন্দ বাবু পুত্রের আচরণের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে পরিমিত মদ্যপায়ী করিবার জন্য একটী কৌশল অবলম্বন করিলেন। সেই কৌশল অবলম্বন করাতে রামনারায়ণ বাবু প্রথম জানিতে পারিলেন যে বাবারও যবনস্পৃষ্ট আহার চলে। মদ্য পান বিষয়ে রাম-মোহন রায়ের শিষ্য ও হিন্দু কালেজের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রভেদ ছিল। রামমোহন রায়ের শিষ্যেরা অত্যন্ত পরিমিতপায়ী ছিলেন, হিন্দু কালেজের অধিকাংশ ছাত্র এরূপ ছিলেন না। একবার রামমোহন রায়ের কোন শিষ্য অপরিমিত মদ্য পান করাতে রামমোহন রায় ছয় মাস তাহার মুখ দর্শন করেন নাই। আনন্দ বাবু পুত্রকে পরিমিতপায়ী করিবার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করিলেন তাহা বর্ণিত হইতেছে। সে কালে মুন্সী আমির আলি সদর দেওয়ানি আদালতের একজন প্রধান উকীল ছিলেন। এই মুন্সী আমির আলি পরে সিপাহী বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্টের উপকার করাতে নবাব উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। যে বাটীতে সদর দেওয়ানী আদালত বসিত, সেই বাটীতেই

খাস কমিসন হইত। খাস কমিসন সদর দেওয়ানির অঙ্গ ছিল বলিলেই হয়। মুন্সী আমির আলি উভয় সদর দেওয়ানী ও খাস কমিসনে ওকালতি করিতেন। আনন্দ বাবুর সহিত মুন্সী আমিরের অত্যন্ত বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। মন্সী সাহেব আনন্দ বাবুকে "রাজদারদোস্ত" বলিতেন। যে বন্ধুকে গোপনীয় কথা বলা যাইতে পারে পারসীতে তাহাকে রাজদারদোস্ত বলে। প্রায় প্রতিদিন মুন্সি আমির আলির বাটী হইতে আনন্দ বাবুর বাসায় প্রকাণ্ড একটা টিনের বাক্স আসিত। রামনারায়ণ বাবু মনে করিতেন যে মুন্সী আমির তাঁহার পিতাকে তরজমা জন্য সদর দেওয়ানীর কাগজপত্র পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। একদিন সন্ধ্যার পর রামনারায়ণ বাবুকে একটী ঘরের ভিতর ডাকিলেন, ডাকিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। রামনারায়ণ বাবু প্রথমে বুঝিতেই পারিলেন না যে ব্যাপারটা কি। তাহার পর দেখিলেন যে আনন্দ বাবু একটী দেরাজ খুলিয়া একটী কর্কস্ক্রু, একটা শেরির বোতল ও একটী ওয়াইনগ্লাস বাহির করিলেন, তৎপরে প্রকাণ্ড টিনের বাক্সটী খুলিলেন। টিনের বাক্স খোলা হইলে, রামনারায়ণ বাবু দেখিলেন যে তাহাতে সদর দেওয়ানির কাগজ নাই, পোলাও কালিয়া, কোপ্তা রহিয়াছে। আনন্দ বাবু রামনারায়ণকে বলিলেন, "তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে এই সকল উত্তম দ্রব্য আহার

করিবে, কিন্তু মদ দুই গ্লাসের অধিক পাইবে না। যখনই শুনিব যে অন্যত্র মদ খাও, সেই দিন তোমার এই খাওয়া বন্ধ করিয়া দিব।” এক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন দ্বারা অন্য একটী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দমন করিবার এরূপ উপায় কেহ কখন আপনার পুত্র সম্বন্ধে অবলম্বন করিয়াছেন কি না বলা যায় না। যাহা হউক, অপরিমিত মদ্যপানের সহিত আহারপ্রিয়তা তুলনা করিলে শেষটীকে অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ বলিতে হইবে। রামনারায়ণ বাবু যেদিন মুন্‌সী সাহেবকে পড়াইতে যাইতেন সেদিন এরূপ আহার পাইতেন না। দিন কয়েক রামনারায়ণ বাবু মুন্‌সী সাহেবের প্রাইবেট মাষ্টারী করিয়াছিলেন। মুন্‌সী সাহেব তাঁহার নিকট School Society দ্বারা প্রকাশিত Spelling Book No. I পড়িতেন। রামনারায়ণ বাবুকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি প্রত্যহ পালকী পাঠাইয়া দিতেন। রামনারায়ণ বাবু এইরূপ গৃহশিক্ষকতা জন্য বেতন লইতেন না। কিন্তু প্রত্যহ শিক্ষকতা কার্য্য সম্পাদনের পর মুন্‌সী সাহেব রামনারায়ণ বাবুকে এক প্লেট কোপ্তা ও এক কোয়ার্ট বোতল উত্তম বীয়র সরাপ খাইতে দিতেন। ঐ বোতল হইতে মুন্‌সী সাহেব নিজে অল্প পরিমাণে পান করিতেন, বাকি রামনারায়ণ বাবুরই থাকিত। এরূপ প্রাইবেট মাষ্টারী কেহ কখন করিয়াছেন কি না বলা যায় না। রামনারায়ণ বাবু মুন্‌সী সাহেবকে পড়াইতেছেন,

আর সম্মুখে কোপ্তার প্লেট আর বীয়র সরাপের বোতল রহিয়াছে, ইহার একটী উত্তম ছবি হইতে পারে। রামনারায়ণ বাবু অভিনব ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও কিছু দিন মদ খাইতেন, তৎপরে ছাড়িয়া দেন। তেইস বৎসর হইল মদ্যপান একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। আনন্দ বাবুর যাবনিক আহার বিষয়ে অন্যান্য অনেক অপূর্ব্ব কাহিনী শুনা যায়। মুন্‌সী উজীর আলি নামে আনন্দ বাবুর একটী কানপুর নিবাসী মুন্‌সী ছিল, তিনি তাঁহাকে পারসী কাগজ পত্র অনুবাদ করিতে সাহায্য করিতেন। মুন্‌সী সাহেব প্রত্যহ টিনের কৌটা করিয়া তাঁহার প্রভুর জন্য মুরগির ডিম অর্দ্ধসিদ্ধ করিয়া তাহার উপর লবণ ও মরিচের গুঁড়া ছড়াইয়া আনিতেন। একদা তিনি এই কৌটা রাখিয়া নীচে প্রস্রাব করিতে গিয়াছিলেন এই অবসরে রামনারায়ণ বাবুর নিতান্ত বালক জেঠতুত ভাই যাঁহার উপর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিবার ভার অর্পিত ছিল এবং যাঁহাকে তাঁহার কাকী "বংশধর" বলিয়া ডাকিতেন— ঐ কৌটা লইয়া নিকটস্থ স্নানাগারের মধ্যে লইয়া গিয়া কৌটার অন্তর্গত কয়েকটী ডিম্ব—কি পদার্থ না জানিয়া উত্তম খাদ্য মনে করিয়া কপাকপ্ খাইয়া টিনের কৌটা যেমন বন্ধ ছিল সেইরূপ বন্ধ করিয়া আবার রাখিয়া দিলেন। পরদিবস আনন্দ বাবু ডিম পায়েন নাই বলাতে মুন্‌সী সাহেব বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তৎপরে কে খাইল

অনুসন্ধান পড়িয়া গেল কিন্তু তাহা যে "বংশধর" খাইয়াছিলেন তাহা কেহ অনুভব করিতে পারিলেন না। অবশেষে কিছুই মীমাংসা করিতে না পারিয়া মুন্‌সী সাহেব স্থির করিলেন যে শয়তানে খাইয়াছে। এক্ষণে যেমন কলিকাতার অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দুর বাটীতে পর্য্যন্ত কেহ পিয়াজ ব্যবহার করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না, সেকালে সেরূপ ছিল না। পিয়াজ খাওয়া হয় ইহা লোকে যাহাতে টের না পায়, এমত উপায় অবলম্বন করা হইত। যেদিন আনন্দ বাবুর সহধর্ম্মিণীকে মাংসে পিয়াজ দিতে হইত সেদিন আনন্দ বাবু রামনারায়ণ বাবুকে বলিতেন যে আজ তোমার মাকে মাংসে (Cepa) দিতে বলিয়া আইস। সিপা শব্দ লাটিনভাষায় পিয়াজ বুঝায়। লাটিনভাষায় ঐ শব্দ পিয়াজ বুঝায় রামনারায়ণ বাবু লাটিন অভিধান খুজিয়া তাঁহার পিতাকে বলিয়া দিয়াছিলেন। আমরা উপরে উল্লিখিত মুন্‌সী উজীর আলি বিষয়ে দুই একটী গল্প বলিয়া আনন্দ বাবুর বৃত্তান্ত সমাপন করিব। রামনারায়ণ বাবু তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর দিনকয়েক সংস্কৃত কালেজের দ্বিতীয় ইংরাজী শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদিন পড়াইতেছেন এমন সময়ে মুন্‌সী সাহেব আসিয়া উপস্থিত। তিনি গোপনে রামনারায়ণ বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি কানপুর যাইতেছি, আর কলিকাতায় আসিব না। আমি তোমাকে তোমার পিতার হস্তে লিখিত

মুরগির ডিমের আদেশের কতকগুলি চিরকুট দেখাইয়া কিছু টাকা ঠকাইয়া লইয়াছি তাহা আমাকে ক্ষমা করিবে। শেষ বিচারের দিন আমাকে ঈশ্বর দোষী বলিয়া গণ্য না করেন, এই জন্য তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" মুন্সীসাহেব বিবেকের দংশনজ্বালা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এইরূপ ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহাদিগের চিত্ত ক্রমাগত কুকর্ম্ম করা জন্য কঠিন না হইয়াছে তাহারা এ জ্বালা হইতে কখন নিষ্কৃতি পায় না। মুন্সী সাহেব একদিন রামনারায়ণ বাবুকে বলিয়াছিলেন "অদ্য রাস্তায় আসিবার সময় একজন ব্যক্তিকে 'দুঃখে গেল কাল চিরদিন,' এই গান গাইতে শুনিলাম, এই গানটী আমার অবস্থা ঠিক বর্ণনা করিতেছে।" মুন্সী সাহেব! ঐ গানটী কেবল তোমাতে খাটে এমন নহে, পৃথিবীর অনেক লোকের প্রতিই খাটে।

হরিহর বসু।

হরিহর বসু আনন্দ কিশোর বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আনন্দ কিশোর বসু অধিকাংশ জীবন নগরে যাপন করিয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে বাদল গ্রামে আসিতেন মাত্র। কিন্তু হরিহর বসু সমস্ত জীবন পল্লীগ্রামে কাটাইয়াছিলেন। বাল্যকালে কখন কখন নগরে আসিতেন। আমাদিগের লিখিবার বিষয় গ্রাম্য ব্যাপার ও ঘটনা। কিন্তু আনন্দ কিশোর বাবুর বেলায় আমরা নাগরিক ব্যাপার ও

ঘটনা বিবৃত করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমরা এক্ষণে ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, খানা খাওয়া মদখাওয়া ইত্যাদি বিপ্লাবক ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া এমন এক ব্যক্তির জীবন-বৃত্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি যিনি শান্ত ভাবে শাস্ত্র চর্চ্চায়, পরোপকারে, তাঁহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া ছিলেন। আমরা এক্ষণে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তর, উপবন ও উদ্যান মধ্যে সংস্থিত পল্লীগ্রামে প্রত্যাগমন করিলাম। হরিহর বসু বাল্যকালে অতি অল্পই ইংরাজী পড়িয়াছিলেন কিন্তু সংস্কৃত উহার মধ্যে উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে অন্য এক ব্যক্তির জীবন চরিতে উল্লেখ করিয়াছি যে হরিহর বসু নবযৌবন সময়ে রামমোহন রায়ের গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক মত বিশেষরূপে বিচলিত করিতে পারে নাই। হরিহর বসুর যখন তেইশ বৎসর বয়ঃক্রম তখন তিনি বায়ু অর্থাৎ স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন। তদবধি তাঁহার মৃত্যুকাল চৌষট্টি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি আদৌ কলিকাতায় আসেন নাই। ইংরাজী ১৮৬৭ শালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি বাল্যকালে কলিকাতা যেরূপ দেখিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা তাঁহার মৃত্যুকালে নগরের যে কত শোভা ও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না, কিন্তু তিনি সে সকল উন্নতি কখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন নাই, বাদল গ্রামে চির-কাল কাটাইয়াছিলেন। স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত তিনি পালকী

চড়িতে পারিতেন না। পালকীর নাড়া চাড়াতে তাঁহার এমনি কষ্ট হইত যে তিনি তাহাতে মৃত্যুযাতনা বোধ করিতেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তিনি গ্রামে চিকিৎসা করিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু কাহার নিকট হইতে কিছু লইতেন না। একদা গড়াই গ্রামে একটা রোগী দেখিতে তাঁহাকে পালকী করিয়া তথায় যাইতে হইয়াছিল। পালকীর নাড়া চাড়ায় তিনি রাস্তায় এমনি কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন যে গড়াই গ্রামে পৌঁছিয়া স্নান করিয়া, ডাব খাইয়া ধড়ে প্রাণ আসিল এমন বোধ করিলেন! তেইশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে যখন তাঁহার বায়ুরোগ উপস্থিত হয়, তখন বাটীমধ্যে ও গ্রাম মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মহাযোগেন্দ্র রস ঔষধ, মধ্যম নারায়ণ তৈল, মিছরির পানা, চিনির পানা, পেঁপে, ডাবের নেয়াপাতি, তালের ফোঁফল, রুইমাছের মুড়ো প্রভৃতি বায়ু রোগের সেবার জন্য যত উপকরণ আবশ্যক তাহা আহরণে বাটীর সমস্ত লোক ও গ্রামের বন্ধুবান্ধব প্রবৃত্ত হইলেন। বায়ুরোগ নিবন্ধন তিনি একাকী থাকিতে পারিতেন না, গ্রামের লোকে পালা করিয়া দিন রাত তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিয়া তাঁহার সহিত গল্প করিত। পুষ্করিণীতে কাহার জালে বৃহৎ রুই মাছ পড়িলে তাহা তাঁহাকে আনিয়া দিত। সেকালে পল্লীগ্রামে এখন অপেক্ষা পরস্পর সহানুভূতি অধিক ছিল। চৈতন্য-চরিতামৃতে লেখা আছে, "দেবসম্বন্ধ

হতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা।" ইংরাজী সভ্যতা ও জিনিস পত্রের দুস্মূল্যতা প্রভাবে স্বার্থপরতা বৃদ্ধি জন্য উক্ত গ্রাম্য সহানুভূতি ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। গ্রামে হরিহর বসুর বিলক্ষণ আধিপত্য ছিল। সে আধিপত্যের দুইটী কারণ ছিল। প্রথম কারণ, তাঁহার অসংখ্য সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ ছিল; দ্বিতীয় কারণ, তিনি আয়ুর্ব্বেদ জানিতেন এবং অর্থ না লইয়া লোকের চিকিৎসা করিতেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রাম নারায়ণ বাবু আমাদিগকে বলেন যে তাঁহার খুড়া মহাশয় তাঁহাকে অনেক সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করাইয়া ছিলেন, তাহার মধ্যে দুই চারিটী এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে;—

ধনাগমো নিত্যং অরোগিতাচ প্রিয়াচ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ।
বশস্থ পুত্র অর্থকরী চ বিদ্যা ষটজীবলোকেষু সুখানি রাজন॥
বিনা ধনেন সংসারঃ নয়নেন বিনা বপুর্ধীয়া
বিনা বৃথা জন্ম বিনা কৃষ্ণেণ জীবতু॥

রাম নারায়ণ বাবু বলেন যে তাঁহার খুড়া মহাশয় তাঁহাকে যে সকল শ্লোক মুখস্থ করাইয়া ছিলেন তাহার মধ্যে কোন কোন শ্লোকের তাঁহার শেষ দুই পাদ স্মরণ আছে, আবার কোন কোন শ্লোকের শেষ পাদমাত্র স্মরণ আছে। প্রথমোক্ত প্রকার শ্লোকের দৃষ্টান্ত;—

আকর্ণয়ন্তি কিল কোকিলকূজিতানি সন্ধ্যা
তুমেবনিজসপ্তনলিং কিরাতাঃ॥

শেষোক্ত প্রকার শ্লোকের দৃষ্টান্ত; কিতমারণ্যমৌষধম।

রাম নারায়ণ বাবু হিন্দু কালেজে পড়িবার সময় তিনি তাঁহার সমাধ্যায়িগণ বাঙ্গালার প্রতি কিছু মনোযোগ দিতেন এবং না। তখন তাঁহাদিগের পণ্ডিত পূর্ব্বে বিখ্যাত রামকমল সেনের পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার অনুরোধে তিনি কালেজে পণ্ডিতী কর্ম্ম পান। বাঙ্গালা পাঠের সময় উপস্থিত হইলে তাঁহারা পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে পাকক্রিয়া ঘটিত এক প্রসঙ্গ পাড়িতেন, তাহাতেই সময় কাটিয়া যাইত, আর বাঙ্গালা পড়িতে হইত না। সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে যাহা তাঁহার খুড়া মহাশয় ও জেঠা মহাশয় মুখস্থ করাইয়াছিলেন তিনি তাহাই জানেন, আর কিছু জানেন না। বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের প্রতি যাঁহার এরূপ অনাদর তিনি যে তাঁহার খুড়া মহাশয় কর্ত্তৃক মুখস্থ করান শ্লোকের দুই পাদ কি তিন পাদ ভুলিয়া যাইবেন ইহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তিনি যাহা ভুলিয়া গিয়াছেন তাহাতে সংসারের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে না যেহেতু ঐ সকল পাদ যে সকল শ্লোকের অংশ তাহা অতি প্রসিদ্ধ শ্লোক।

হরিহর বসু বিলক্ষণ আয়ুর্ব্বেদ জানিতেন। নিজের জন্য যে মধ্যম নারায়ণ তৈল আবশ্যক হইত তাহা তিনি নিজে প্রস্তুত করিতেন, এবং গ্রামের লোকদিগের জন্য সোমনাথ রস, মন্মথ রস, এবং বসন্তকুসুমাকর রস প্রভৃতি প্রধান প্রধান ঔষধ পরিশ্রমের পারিতোষিক না লইয়া কেবল উপাদানের ব্যয় লইয়া প্রস্তুত করিয়া দিতেন।

তাহাতে ব্যবসায়ী বৈদ্যের নিকট হইতে ঐ সকল ঔষধ লইলে লোকের যে ব্যয় পড়িত তাঁহার নিকট হইতে লইলে অনেক অল্প ব্যয় পড়িত। তিনি বলিতেন মন্মথ রসের ঔষধ গুণবর্ণনাতে এই সকল কথা আছে; "বৃদ্ধ ষোড়শ-বদ্ভবেৎ" অর্থাৎ ঐ ঔষধ সেবন করিলে বৃদ্ধ ষোড়শবর্ষীয় যুবকের ন্যায় হয়। রোগীকে কখন গঙ্গা যাত্রা করিতে হইবে হরিহর বসু তাহা নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দিতেন এই জন্য তাঁহার গ্রামে অসীম প্রতিপত্তি ছিল। নাড়ী-প্রকাশ গ্রন্থ তাঁহার বিলক্ষণ দেখা ছিল। সেই নাড়ী প্রকাশ গ্রন্থে নাড়ীর গতি সর্পের ন্যায় হইলে কিম্বা ভেকের ন্যায় হইলে রোগী কতক্ষণ পরে মরিবে তাহা লিখিত আছে। হরিহর বসু গ্রামের বাটীতেই বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দকিশোর বসু তাঁহাকে প্রতিপালন করিতেন। আনন্দকিশোর বসুর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামনারায়ণ বাবু তাঁহাকে প্রতিপালন করিতেন। বাদলগ্রাম হইতে নড়িতে হইলে হরিহর বসুর মহাবিপদ জ্ঞান হইত। একবার আলিপুরের আদালত হইতে তাঁহার প্রতি সমন জারী হয়। রামনারায়ণ বাবু বলেন যে তাঁহার খুড়া মহাশয় ইহাতে আপনাকে যে কতদূর বিপদাপন্ন বোধ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত। রামনারায়ণ বাবু অনেক টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। শাস্ত্রচর্চ্চা ব্যতীত তিনি

অন্য সময়ে গ্রাম্য দলাদলিতে ও বন্ধুদিগের সহিত তাস খেলাতে যাপন করিতেন। হরিহর বসু উদ্যান-পালন-কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতেন। তিনি স্বহস্তে উদ্যানের ঘাস নিড়াইতেন, এবং বৃক্ষসকলের পরিবর্দ্ধনের উপায় করিয়া দিতেন। এবিষয়ে তিনি অনেকের আদর্শ স্থল হইতে পারেন। গ্রামের সকল লোকে তাঁহাকে হরিখুড়া বলিয়া ডাকিত, অতএব তিনি আমাদিগেরও খুড়া। আমাদিগের সেদিন বিলক্ষণ স্মরণ হয় যেদিন তিনি তাঁহার স্বহস্তে রোপিত বোম্বাই আমের গাছের প্রথম ফল আমা-দিগকে খাওয়াইলেন। আমরা তাহাতে অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করাতে তিনি বলিলেন, "অদ্য আমার পরিশ্রম সার্থক হইল।" ১২৭৪ সালে ম্যালেরিয়া জ্বরে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময় হইতে বাদলগ্রামের মাঝের পাড়ার বসুরা আপনা-দিগের পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করেন। তখন পৈতৃক বাটীতে যে কুলুপ পড়ে সে কুলুপ অনেক দিন খোলা হয় নাই। কয়েক বৎসর পরে রামনারায়ণ বাবু পৈতৃক বাটী দর্শন করিতে যান। সেই সময়ে তাঁহার মনে যে সকল ভাব উপস্থিত হয় তাহা বর্ণনা করিয়া তিনি একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখেন, সেই প্রবন্ধ আমরা পরে প্রকাশ করিব।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে গ্রামে হরিহর বসুর আধিপত্যের প্রধান কারণ তাঁহার অসংখ্য সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ থাকা। এক্ষণে ভারতবর্ষের গ্রাম সকলে

যেমন পাশ্চাত্য-আলোকবিস্তারকারী লোক থাকা চাই, তেমনি সংস্কৃতজ্ঞ লোকও থাকা চাই। তাহা না হইলে হিন্দু গ্রাম হিন্দু গ্রাম বলিয়া বোধ হইবে না। বড় দুঃখের বিষয় যে এক্ষণে পল্লীগ্রাম হইতে ভট্টাচার্য্য-দিগের টোল ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা নিঃস্বার্থভাবে ছাত্রদিগকে যে সংস্কৃত শিক্ষা প্রদান করেন তাহা অতি মহদ্দর্শন। সে দর্শন এত মহৎ যে সভ্যাভিমানী দেশের লোকেরাও তাহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন। এই সকল টোল যাহাতে বজায় থাকে এরূপ কোন উপায় নির্দ্ধারণ করা আমাদিগের ধনাঢ্য ব্যক্তি-দিগের কর্ত্তব্য। রাইন নদীতীরে সংস্কৃতের মহা আদর, আর গঙ্গাতীরে যাঁহারা তাহার চর্চ্চা করেন তাঁহাদিগকে অনাহারে কাল যাপন করিতে হয়।

বহুদিবস পরে পৈতৃকবাটী দেখিয়া রামনারায়ণ বাবুর মনের ভাবোচ্ছ্বাস।

আমরা পাঠকবর্গের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে অনেক দিন পরে মেলেরিয়া-গ্রস্ত স্বগ্রামের পৈতৃক বাটী দেখিয়া রামনারায়ণ বাবুর মনে যে সকল ভাব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা তিনি যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নিবদ্ধ করেন তাহা আমরা তাঁহাদিগকে উপহার দিব। সে অঙ্গীকার আমরা পালন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

"আমি বাটীতে আসিয়া প্রথম যখন আমার প্রাচীন সমবয়স্ক বৃক্ষগুলিকে (my old contemporary trees*) দেখিলাম তখন মন কি পর্য্যন্ত উদ্বেলিত হইল তাহা কি বলিব? এই সকল বৃক্ষতলে কত ক্রীড়া কৌতুক করিয়াছি, কত প্রকার আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিয়াছি, এই সকল বৃক্ষতলে বসিয়া কত ভাবী সুখের ছবি আঁকিয়াছি, শূন্যে রামধনুর বর্ণে চিত্রিত কত শোভন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছি, তাহা কি বলিব? পৃথিবীর যে ভাগে আমি ভ্রমণ করি না কেন তাহার চিত্র আমাদিগের মন হইতে কখনই অন্তর্হিত হইবে না। জর্ম্মেনী দেশীয় জ্ঞানী কেণ্ট (Kant) তাঁহার ঘরের যে জানালার নিকট বসিয়া গ্রন্থ রচনা করিতেন সে জানালার সম্মুখে অন্যের ভূমির উপর স্থিত একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছিল, যখন শুনিলেন ভূস্বামী সেই বৃক্ষটী ছেদন করিতে চাহেন তখন তাঁহার মহাবিপদ জ্ঞান হইল। তিনি ভূস্বামীকে অনেক অনুরোধ করিয়া সেই বৃক্ষ রক্ষা করিলেন। কেণ্ট কি জন্য ঐ বৃক্ষটীর বিনাশ মহাবিপদ জ্ঞান করিয়াছিলেন তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি। আমি বাটীতে আসিয়া সে কালের স্কুলমাষ্টার কৃষ্ণমোহন বসুর পুত্রের নিকট বাটীর চাবি চাহিয়া পাঠাইলাম। চাবি আনিবার পূর্ব্বে, যখন গ্রামের বায়ু আমার গাত্র স্পর্শ করিতে

---

* Cowley.

লাগিল, তাহা মেলেরিয়া সংস্পৃষ্ট জানিয়াও আমি ইংরাজী কবি গ্রের (Gray) রচিত নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি আবৃত্তি করিতে লাগিলাম।

"Ah, happy groves!† ah, pleasing shade!
Ah, fields beloved in vain!
Where once my careless childhood strayed
A stranger yet to pain!
I feel the gales that from ye blow
A momentary bliss bestow,
As waving fresh their gladsome wing,
My weary soul they seem to soothe
And, redolent of joy and youth,
To breathe a second Spring."

নিরর্থক প্রেম করিয়াছি তোরে
হে সুখদা কুঞ্জ? সুখদ প্রান্তর!
যথা যাপিয়াছি প্রমাদী কৈশোর
যখন দুঃখ দুঃখ দিত না মোরে।
বায়ু যে বহিছে স্পর্শিয়া তোমায়
ক্ষণস্থায়ী সুখ দিতেছে আমায়।

† "Hills" শব্দের পরিবর্ত্তে groves" শব্দ বসাইয়া দেওয়া গিয়াছে। বিধাতা বঙ্গদেশের অধিকাংশে পর্ব্বত দেন নাই।

নাড়িয়া নিজের নবীন প্রফুল্ল পক্ষ
যৌবন ও হর্ষ ভাবে পূর্ণ সুরভিত
শান্তি ভাণে ভুলাইছে মম ক্ষিণ্ণ বক্ষ
হানিয়া বসন্ত যেন করিছে হ্লাদিত॥

তৎপরে চাবি আনিয়া সদরবাটীর ঘরগুলি খুলিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। ইহা দেখিবার সময় পূর্ব্বের যে কত কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল তাহা কি বলিব? বাহিরের দুইটী ঘর পাকা হইবার পূর্ব্বে আমার বাল্যকালে তথায় আটচালা ছিল। সেই আটচালার কথা মনে পড়িল। সেই আটচালার উত্তর বিভাগের উত্তর পশ্চিম কোণে রাধামোহন ঘোষ একটী টুলের উপর বসিয়া থাকিতেন। রাধামোহন ঘোষজা মহাশয় অতি সদাশয় অমায়িক উদার স্বভাব লোক ছিলেন, দোষের মধ্যে এই যে পাশা খেলিবার সময় তিনি এক এক বার অত্যন্ত রাগিয়া উঠিতেন। এমনি রাগিয়া উঠিতেন যে একবার তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে এমনি জোরে চড় মারিয়াছিলেন, যে তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়! এইরূপ এক চড়ে লোকের মৃত্যু হয় ইহা অভাবনীয় কিন্তু এইরূপ ঘটিয়াছিল। ইহাতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে ঘোষজা মহাশয় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আমাদিগের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমরা ছেলেবেলা তাঁহার তেফুকুরে দালানওয়ালা বাটী জঙ্গলপরিপূর্ণ অবস্থায় দেখিয়াছি, এক্ষণে তাহার

চিহ্ন মাত্র নাই। উল্লিখিত আটচালায় আমার জেঠা মহাশয় আমাকে আপনার হাঁটুর উপর বসাইয়া চাণক্য শ্লোক ও "গাড ঈশ্বর" "লাড ঈশ্বর" পড়াইতেন। যখন উক্ত প্রকাণ্ড আটচালা ভাঙ্গিয়া বৈঠকখানা ঘর তৈয়ারী হইতেছিল তখন তাহার সম্মুখে যে একটী ক্ষুদ্র আটচালা ছিল তথায় মাদুরের উপর শুইয়া মেকলে পড়িতাম। ঐ প্রকাণ্ড আটচালা ভাঙ্গিয়া বাটীতে প্রবেশ পথের দুইদিকে দুইটী বৈঠকখানা ঘর তৈয়ারী হয়, উক্ত পথ ও উক্ত দুইটী বৈঠকখানা এক ছাদের নিম্নে স্থিত। ঐ দুই ঘরের মধ্যে যে ঘরে আমি বসিতাম তাহাতে প্রবেশ করিবামাত্র পূর্ব্বকালের কত কথা যে মনে হইল তাহা কি বলিব? এই ঘরে বসিয়া আমি গোলবাটীর অভয় চরণ নামক যুবক ভট্টাচার্য্যের সহিত কথোপকথন করিতাম। তিনি সে সময়ে নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার নিকট আমি প্রথম জানিলাম যে নবদ্বীপ আমাদের বঙ্গদেশের অক্সফোর্ড, তথায় কর্ণাট, বিষ্ণু, কাঞ্চী ও পঞ্জাবের ছাত্র আসিয়া অধ্যয়ন করে এবং তাহারা বঙ্গদেশের ছাত্রদিগের সহিত সংস্কৃতে কথোপকথন করে। এই ঘরে বসিয়া সঙ্গীতশাস্ত্র-নৈপুণ্যাভিমানী সুসভ্য ভরত মালী, যাঁহাকে আমি মালীপো বলিয়া ডাকিতাম কিন্তু গ্রামস্থ লোক মালীদাদা বলিয়া ডাকিত তিনি আমার পিতা আনন্দকিশোর

বাবুকে রামমোহন রায়ের "ভুলনা ভুলনা মন নিত্য সত্য সদাত্মাকে" প্রভৃতি গান শুনাইতেন। এই ঘরে শ্রীপতি ঠাকুর কথক, যিনি মহারাজা সর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পারিষদ ছিলেন এবং সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন, তিনি তানপুরা বাজাইয়া আপনার রচিত ঠাকুর ও ঠাকুরাণী বিষয়ক গান আমাদিগকে শুনাইতেন। মেলেরিয়া নিবন্ধন বাটী পরিত্যাগ করিবার অবব্যহিত পূর্ব্বে এই ঘরে আমরা গ্রামের কয়জন বসিয়া "বঙ্গের পূর্ব্বমহিমা" বিষয়ক একটী কবিতা লিখিয়া উপরে "বাদল কবিবৃন্দ কর্ত্তৃক বিরচিত" এই শিরোনাম দিয়া কলিকাতায় একটী মহাসভায় প্রেরণ করি। উক্ত কবিতা হইতে বঙ্গের যুবকদিগের শারীরিক অবনতি বিষয়ক কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল;

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ছিল প্রচলিত।
বাঙ্গালার প্রতিগ্রামে ব্যায়ামের রীত॥
প্রত্যেক উৎসবে যত মল্লগণ আসি।
তুষিত দর্শক মন নৈপুণ্য প্রকাশি॥
রায়বাস বর্ষা অসি আপন আপন।
লইয়া করিত ক্রীড়া জিনিবারে পণ॥
মুদ্গর লইয়া হস্তে ভদ্র যুবজন।
ভাঁজিতেন প্রতিদিন করিতেন ডন॥
এখন সে সব চর্চ্চা দেখা নাহি যায়।
গ্রন্থের চর্চ্চায় শুধু সময় কাটায়॥

*　　　　*　　　　*

অর্থলোভী পিতামাতা অর্থের কারণ।
পুস্তক পেষণী যন্ত্রে করিয়া পেষণ॥
সুকুমার শিশু বৃন্দে কি বলিব হায়!
কেবল অর্থের জন্য পরকাল যায়॥

তৎপরে যে বৈঠকখানা ঘরে আমার খুড়া মহাশয় হরিহর বসু বসিতেন সে ঘরে আসিলাম। পূর্ব্বে এই ঘরে ঢুকিবামাত্র মধ্যম নারায়ণ তৈল ও আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধের কত বিচিত্র গন্ধ অনুভব করা যাইত; তিনি এই ঘরে বসিয়া শাস্ত্রের কত শ্লোক আবৃত্তি করিতেন ও সে কালের গল্প করিতেন। এই ঘরে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কত লোকের সমাগম হইত। এই ঘরে কত শাস্ত্রালাপ কত ক্রীড়া কৌতুক হইত! ইহা গ্রামের ক্লব স্বরূপ ছিল। কেবল প্রত্যহ দুই তাল তামাক খরচ করিতে হইত মাত্র তাহাতেই গ্রামের সকল লোক বশীভূত। তাহাদিগের সরলাত্মাকে বশ করিবার জন্য বেশী কিছু আবশ্যক হইত না। সদর বাটী পরিত্যাগ করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। এই বাটীর ভিতরের পূবের ঘর খড়ো ও দক্ষিণের দীর্ঘ ঘর পাকা, তাহাতে অনেক কুঠরী আছে। এই পূবের ঘরের দাওয়াতে গ্রামের ভঞ্জ বংশের কন্যা আমার বৃদ্ধ অন্ধ পিতামহী (আমার ঠাকুরের জেঠাই) বসিয়া আমাদিগের নিকট সিংহির মামা ভম্বোল দাসের গল্প

করিতেন এবং আমরা তাহা হাঁ করিয়া শুনিতাম। তিনি এই পূবের ঘরে শেষ রাত্রিতে জাগিয়া বিছানায় শুইয়া শুইয়া আমাদিগকে

"সুমেরু সমতুল্য হিরণ্য দানে।
নহি তুল্য নহি তুল্য গোবিন্দ নামে॥"

এই প্রকার কত পদ্য অভ্যাস করাইতেন। বুড়ীর পার্শ্বে একটী নেকড়াতে কতকগুলি কাটা সুপারি বাঁধা থাকিত ও সম্মুখে একটী জলের ঘটি থাকিত। সেই সুপারি বাঁধা নেকড়া ও জলের ঘটি তাঁহার প্রাণ ছিল। বুড়ি এমন রাশভারি ব্যক্তি ছিলেন যে যখন নিকটস্থ উদ্যানে দিনের বেলা সদরের লোকের অনুমতি লইয়া গ্রামের কোন ব্যক্তি নারিকেল পাড়িতে উঠিত সে তাঁহার জ্বালায় নারিকেল পাড়িতে পারিত না। প্রথম নারিকেলটী ভূমিতে পাড়িবার শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে তিনি এমনি এমন এক "কেও" ঝাড়িতেন যে তাহাতে বৃক্ষারোহীর শরীর অবশ হইয়া গাছ হইতে তাহা তৎক্ষণাৎ একেবারে নীচে পড়িবার সম্ভাবনা হইত। বুড়ী আপনার শরীরের লোলচর্ম্মের সহিত নাতি নাতিনী ও ছোট ছোট নাত বউএর গায়ের আঁটাসোটা অথচ কোমল চর্ম্মের বৈপরীত্য অনুভব করিতে বড় ভালবাসিতেন, সে জন্য তিনি সর্ব্বদা তাহাদিগের গা টিপিয়া টিপিয়া দেখিতেন। এই পূবের ঘরের দাওয়ায় তাঁহার কন্যা আমার বিধবা

পিসিঠাকুরাণী তাঁহার মাতার পার্শ্বে সর্ব্বদা বসিয়া থাকিতেন। পিসিঠাকুরাণী অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি বলিতেন যে মন বেলোয়ারি গ্লাসের ন্যায়, একবার মন ভাঙ্গাভাঙ্গি হইলে, তাহা আর ঠিক যোড়া লাগে না! অতএব বন্ধুতাতে অত্যন্ত সতর্কতা আবশ্যক। ইহার এক নাতনী ছিল, সে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় অপস্মার রোগে আক্রান্ত হইয়া মরে। সে পাড়ার একটী বালিকার সহিত "গঙ্গাজল" পাতাইয়াছিল। সেই বালিকা একবার আমাদিগের বাটিতে আসিয়াছিল, কোন প্রয়োজন বশতঃ ঘরের বাহিরে যাইবে এমন সময়ে বৃষ্টি পড়িতেছিল, নাতিনী বলিল "যাইওনা যাইওনা, গঙ্গাজলে কুব্‌জল পড়িয়া সব কুব্‌জল হইয়া যাইবে।" আমার পিসিঠাকুরাণীর উক্ত নাতিনী অশিক্ষিতা কিন্তু অশিক্ষিতা হইয়াও এই বাক্যে কি অসাধারণ কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। এইরূপ পূর্ব্বের কত কথা স্মরণ হইতে লাগিল তাহা আর কি বলিব? পূর্ব্বের সে কথা সকল স্মরণ হইয়া মন কিরূপ আকুল হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। আমি মনে করিয়াছিলাম যে আমার এই বৃদ্ধ অবস্থাতে আমার জন্মস্থানে জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিব, কবির "Oh blest Retirement! friend to life's decline" "হে বার্দ্ধক্যসুহৃৎ! মঙ্গল নিভৃত বাস" এই বাক্যের যাথার্থ্য অনুভব করিব কিন্তু বিধাতা সেরূপ

লিখেন নাই, হা মেলেরিয়া! তুই দেশের কি সর্ব্বনাশ না করিতেছিস! তুই গ্রামকে গ্রাম বিজন ও বন্যশূকরাদি হিংস্রক জন্তুর আবাস করিতেছিস্। তুই কত বাস্তুভূমি নির্জ্জন করিয়াছিস্ তাহার সংখ্যা নাই। তুই অনেক বাটীতে প্রদীপ দিবার একটা লোক পর্য্যন্ত রাখিতেছিস্ না। তুই বৃদ্ধ পিতামাতার সমস্ত আশা ভরশা একটীমাত্র পুত্রকে তাঁহাদিগের বক্ষ হইতে অপহরণ করিতেছিস্। তুই নবদম্পতির একটীকে আর একটীর আলিঙ্গন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে অপার শোকার্ণবে মগ্ন করিতে-ছিস; যে সকল যুবকদিগকে তুই একেবারে প্রাণে না মারিতেছিস তাহাদিগের শরীরের গ্রন্থি হইতে বল ও তাহা-দিগের মন হইতে যৌবনসুলভ স্ফূর্ত্তি একেবারে চিরদিনের মতন হরণ করিতেছিস্! তোর নিরাকরণের জন্য রাজাও মনোযোগ দেন না, সাধারণবর্গেরও মনোযোগ নাই। রাজা বিদেশীয়, আমাদিগের দেশের প্রতি তাঁহার কেন আন্তরিক মমতা হইবে? তিনি এক একবার টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া কমিসন বসাইয়া ও কলেক্টরের প্রতি এক একটী শূন্যগর্ভ আদেশ প্রচার করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। আমাদিগের প্রধান প্রধান দেশহিতৈষী ব্যক্তিরা কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যস্ত, কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে লোকের অগ্রে বাঁচা চাই, তাহা না হইলে রাজনৈতিক অন্দোলন কে করিবে? আমাদিগের অরণ্যে

রোদন মাত্র। কে আমাদিগের কথা শুনে? মাতর্বঙ্গভূমি! তুমি ছারখার হইতেছ, তোমার কেহ সম্বাদ লয় না। আরঙ্গজেব বাদসাহ তোমাকে "জেন্নতল বোলাদ" অর্থাৎ দেশ সকলের মধ্যে স্বর্গভূমি বলিয়াছিলেন। কোন ইংরাজ কবি বলিয়াছেন—

"Nature's chiefest bounties fall
To thy productive fields, Bengal."
"প্রধানতঃ বঙ্গ! তব ক্ষেত্রোপরে
প্রকৃতি দানিছে দান অকাতরে।"

তুমি এত উর্ব্বরা কিন্তু তোমাতে লোক না থাকিলে কে তোমায় কর্ষণ করিয়া শস্য ও ফল উৎপাদন করিবে।"

এই খানেই রামনারায়ণ বাবুর প্রবন্ধ শেষ হইল, এবং বাদলগ্রামের মাঝের পাড়ার বসু দিগের বৃত্তান্ত শেষ হইল। আমরা ইহার পরে গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের মধ্যে যাহাদিগের চরিত্রে একটু বিশেষত্ব অথবা কিছু অদ্ভুতত্ব ছিল তাহাদিগের বৃত্তান্ত লিখিয়া গ্রামের পুরোহিত, ডাক্তার, বৈদ্য, স্কুলমাষ্টার, গুরুমহাশয়, মালী, গোয়ালা প্রভৃতির ক্রমান্বয়ে বর্ণন করিব।

কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম।

ইনি গ্রামের তপস্বী বংশীয় ব্যক্তি ছিলেন। ইহাঁর উপাধি সার্ব্বভৌম ছিল। ইনি বাহুলীন গ্রামের সাবর্ণ বংশীয় জমীদার সন্তোষ রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন। সন্তোষ

রায় একবার বাকি খাজনা জন্য মুর্শিদাবাদের নবাবের সৈন্য দ্বারা গ্রেপ্তার হইয়া দিন কতক তথায় বন্দী অবস্থায় থাকেন। এই অবস্থাতে তিনি এক দিন একটী প্রকাণ্ড খাসি একাকী আহার করেন। নবাব বাহাদুর ইহা অবগত হইয়া বলিলেন, "এ সকস আপকা জমিদারীকা আমদানি সব খা ডালতা হায়, সদর মালগুজারি কেস্‌তরে করেগা এসকো ছোড় দেও। আর কভি এস্‌কো পাসসে খাজনা মৎ আদায় করো" তৎপরে তিনি কারামুক্ত হইয়া রাজকর হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নিষ্কণ্টকে আপনার জমিদারী উপভোগ করিতে লাগিলেন। কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম মহাশয় অতি বিদ্বান, উদার স্বভাব ও বদান্য ব্যক্তি ছিলেন। ইনি একদিন বাদলগ্রাম হইতে বেলা দুই প্রহরের সময় বাহুলীন গ্রামে যাইতেছিলেন। গ্রাম হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ আসিয়া দেখেন যে কক্ষে কলসধারিণী গুটি কতক বাগ্‌দি স্ত্রীলোক সূর্য্যের উত্তাপে ক্লিষ্ট হইয়া একটী গাছের ছায়ায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছে। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছারা! তোমরা কি বলিতেছ?" তাহারা তাঁহাকে বলিল, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমাদিগকে দীঘি হইতে জল লইয়া যাইতে হয়, ইহা আমাদিগের গ্রাম হইতে দুই ক্রোশের কম নহে। এই বাদল গ্রামে এতগুলি ভদ্রলোক আছেন, তাঁহারা যদি এখানে একটা পুকুর কাটাইয়া দেন তাহা হইলে আমা-

দিগকে আর অতদূর কষ্ট করিয়া জল আনিতে হয় না। নিকটে জল পাইয়া বাঁচি।” ইহাতে সার্ব্বভৌম মহাশয় আর তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া বেহালায় গিয়া সন্তোষ রায়ের নিকট বাদল গ্রামের উত্তরাংশে একটুকু জমী ভিক্ষা করেন। কিন্তু ক্ষুদ্রমনা উদরপরায়ণ জমীদার মালজমী বলিয়া দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় সার্ব্বভৌম মহাশয় নিজের জয়রামপুর গ্রামের ব্রহ্মোত্তর জমীর সহিত এওজ দোয়জ করিয়া সেই নিরূপিত জমীর উপর একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করেন। অদ্যাবধি সেই পুষ্করিণী তপস্বী পুকুর নামে অভিহিত আছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত সার্ব্বভৌম মহাশয় গ্রামের অপর তিন দিকে তিনটী পুষ্করিণী খনন করান, তাহাও অদ্যাপি “তপস্বী পুকুর” নামে খ্যাত আছে।

তপস্বী বংশের কতকগুলি ব্যক্তি বারুইপুরের জমীদার-দিগের এলাকায় বাস করেন। এক সময়ে উক্ত জমীদারেরা তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে আদালতে সাক্ষ্য দিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ বলিয়া তাহা করিতে অসম্মত হয়েন। এইরূপে তাঁহারা উত্যক্ত হইয়া স্বগ্রাম ছাড়িয়া বাদল গ্রামে পলাইয়া আসেন। তপস্বীবংশীয় এই সকল ব্যক্তিকে ধর্ম্মবীর বলিয়া আমাদিগের গণ্য করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম বিষয়ে যদি কোন লোকের কোন ভ্রমাত্মক মত থাকে, তথাপি সেই ভ্রমাত্মক মত জন্য তিনি উৎপীড়ন সহ্য করিলে তাঁহাকে ধর্ম্মবীর বলিয়া গণ্য করা

কর্ত্তব্য, যেহেতু তিনি নিজে সেই মতকে সত্য বলিয়া মনে করেন। যিনি যাহা সত্য বলিয়া মনে করেন তাহার জন্য উৎপীড়ন সহ্য করিলে তাঁহাকে ধর্ম্মবীর বলিয়া গণ্য করা কর্ত্তব্য। প্রথমে যাঁহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের অনেক মত ভ্রমসঙ্কুল ছিল, তথাপি তাঁহারা যে ভয়ানক উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য কি তাঁহাদিগকে ধর্ম্মবীর বলিয়া গণ্য করা যাইবে না? সেইরূপ আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া আমরা ধর্ম্মতঃ দূষ্য মনে না করিলেও তথাপি যখন উক্ত তপস্বীবংশীয় মহাত্মারা তাহা ধর্ম্মদূষ্য কার্য্য বোধ করিয়া তজ্জন্য পীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন, এমন কি বাঙ্গালীর সম্বন্ধে সকল বস্তুর অপেক্ষা প্রিয় নিজের বাস্তুভূমি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখন তাঁহারা কি ধর্ম্মবীর বলিয়া গণ্য হইবেন না? যাঁহারা ধর্ম্মবিষয় উৎপীড়ন জন্য ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকায় গিয়া বসতি করেন তাঁহাদিগকে ইংরাজেরা "pilgrim fathers" "সন্ন্যাসী পিতৃ-পুরুষ" এই উপাধি দিয়াছেন। যে সকল তপস্বীবংশীয় মহাত্মারা নিজের বাস্তুভূমি পরিত্যাগ করিয়া বাদল গ্রামে বসতি করেন তাঁহারা কি কিয়ৎ পরিমাণেও ঐ সম্ভ্রান্ত উপাধির যোগ্য নহেন? কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম মহাশয় আজ গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে উক্ত তপস্বী-বংশীয় মহাত্মাদিগের

সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি উঁহাদিগকে সপরিবারে হঠাৎ বাদলগ্রামে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা যাহা ঘটিয়াছে বর্ণনা করিলে তিনি তাঁহাদিগের ধর্ম্মবীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে যত্নের সহিত আপনার বাটীতে আনিয়া তাঁহাদিগকে নিজের ভদ্রাসন বাটী দান করিয়া গঙ্গাতীরে বাসের জন্য সস্ত্রীক গমন করেন। এই পাশ্চাত্য সভ্যতা-জনিত স্বার্থপরতার কালে এরূপ ঔদার্য্য অলীক বলিয়া বোধ হইবে কিন্তু বস্তুতঃ ইহা সত্য। গঙ্গাতীরে প্রয়াণ কালে পথিমধ্যে জমীদার ঘোষ বংশীয় কোন ব্যক্তির সহিত সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। কোথা যাইতেছেন তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সার্ব্বভৌম মহাশয় আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বিবৃত করেন। ইহাতে উক্ত জমীদার মহাশয় তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া আপনাদিগের চৌদ্দ বিঘা বাস্তু ভূমি হইতে তিন বিঘা জমী তাঁহাকে দান করিয়া পুনরায় বাদল গ্রামে তাঁহাকে বাস করান। এক্ষণে "বড় বাগান" বলিয়া একটী আকাট জঙ্গলময় স্থান বাদল গ্রাম মধ্যে আছে। সেই স্থান ঘোষবংশের প্রাচীন পরিত্যক্ত ভদ্রাসন। আর উহার দক্ষিণাংশে তিন বিঘা পরিমিত স্থানে তপস্বীবংশীয়েরা অদ্যাপি বাস করিতেছেন।

কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম মহাশয় সম্বন্ধে একটী অতি রহস্য-জনক কথা গ্রামে প্রচলিত আছে। সার্ব্বভৌম

মহাশয় যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহার অল্পাংশ সামান্য ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অধিকাংশ অতিথি সেবা ও অন্যান্য পরোপকারক কার্য্যে ব্যয় করিতেন। এইরূপ কার্য্যে ব্যয় করাতে তিনি স্ত্রীকে অলঙ্কার প্রদানে সক্ষম হইতেন না। একদিন উঁহার ব্রাহ্মণী কিছু গহনা চাহেন তাহাতে তিনি হাস্য করিয়া থলি হইতে কিছু টাকা বাহির করিয়া পাঁচনলী কণ্ঠ মালার বদলে এক পুটুলি টাকা তাঁহার কণ্ঠে এবং মলের পরিবর্ত্তে দুই পায়ে দুই পুঁটুলি টাকা বাধিয়া দিলেন এবং বলিলেন, গহনা পরা ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য বইত নহে। এইরূপ টাকার পুঁটুলি বাঁধিলে যথেষ্ট হইবে। মিছামিছি স্বর্ণকারকে বানি দিবার আবশ্যক কি? ইহাতে তাঁহার স্ত্রী এতদূর অপ্রতিভ হইয়াছিলেন যে আর কখন তিনি প্রাণান্তে গহনার কথা উত্থাপন করিতেন না। যাহাদিগের স্ত্রীরা গহনার জন্য তাঁহাদিগকে উত্যক্ত করেন তাঁহাদিগকে আমরা এই উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিই। ইহা সত্য বটে যে আমাদিগের সহধর্ম্মিণীরা গহনার জন্য স্বামীর সৎকার্য্যে প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন তথাপি তাঁহারা এ বিষয়ে বিলাতের সীমন্তিনীগণ অপেক্ষা অনেক ভাল। শেষোক্ত সীমন্তিনীগণ রাশীকৃত টাকা বস্ত্রে ব্যয় করিয়া স্বামীকে ফতুর করেন, কিন্তু সে বস্ত্র পরে কোন কাজে আসিবে না কিন্তু আমাদিগের স্ত্রীদিগের স্বর্ণালঙ্কার দুঃখ বিপদের সময় অনেক কাজে আইসে।

স্ত্রীর অলঙ্কার ভারতবর্ষের সেবিংস ব্যাঙ্ক বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম বাদল গ্রামের লোক দ্বারা প্রাতঃস্মরণীয় লোক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। এরূপ ব্যক্তি যে প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া গণ্য হইবেন তাহার বিচিত্র কি? বঙ্গদেশের সে কালের সামাজিক ইতিবৃত্তে ঔদার্য্য ও বদান্যতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় তথাপি কমলাকান্ত সার্ব্বভৌমের অবস্থা বিবেচনা করিলে ইতিবৃত্তেও তাঁহার ন্যায় বদান্যতা ও ঔদার্য্যের দৃষ্টান্ত বিরল।

বৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌম।

ইনি একজন কবি ও নৈয়ায়িক ছিলেন। ইনি এরূপ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন যে একদা কোন রাজার রাজসভায় রাজার প্রতি প্রদক্ষিণে তৎক্ষণাৎ একটী একটী নূতন কবিতা রচনা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ইহাতে রাজা ও তাঁহার সঙ্গে সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলী সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। সার্ব্বভৌম-মহাশয় এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এক সময় তাঁহার কোন ছাত্র তাঁহার অজ্ঞাতে পুস্তক খানি লইয়া বিখ্যাত রামদুলাল সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে যান। তথায় দুই এক জন পণ্ডিত উহাতে ব্যাকরণ ভুল ধরিয়া রামদুলাল সরকারকে পুস্তকখানি ক্রয় করিতে নিষেধ

করেন। তাহাতে উক্ত শিষ্য বিফলমনোরথ হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে বাটী ফিরিয়া আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহাতে শিষ্য সমুদায় বিবরণ ব্যক্ত করিলে পর সার্ব্বভৌম মহাশয় আপনার গন্তব্য পথে গমন না করিয়া একেবারে সশিষ্যে উক্ত সরকার মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হয়েন। উক্ত সরকার মহাশয় তাঁহার আগমনের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধিৎসু হইলে তিনি বলেন, "তোমার সভা-পণ্ডিতেরা আমার পুস্তকখানিতে ব্যাকরণদোষ ধরিয়াছেন, অতএব সেই সকল পণ্ডিতের সহিত এ বিষয়ে বিচার করিতে চাহি।" অনন্তর সার্ব্বভৌম মহাশয় উক্ত সরকার মহাশয়ের আশ্রিত পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া স্বপ্রণীত পুস্তকখানি নির্ভুল প্রমাণ করিয়া লন। পরে উক্ত সরকার মহাশয় যথোচিত মূল্যে পুস্তক খানি ক্রয় করেন। একবার বৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয় শ্রীরামপুরে পাদ্রী কেরী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে বেদব্যাস যেমন এক লক্ষ শ্লোকে মহাভারত রচনা করিয়া-ছেন, আমাকে অনুমতি দেও আমি এক লক্ষ শ্লোকে ইংরাজ রাজত্ব বর্ণনা করি, কিন্তু একথার উত্তর প্রাপ্তির পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম মহাশয় কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়েন। সার্ব্বভৌম মহাশয় ঐ গ্রন্থ রচনা করিলে তাহা একটী পরমাদ্ভুত মহাভারত হইত তাহার সন্দেহ নাই। কোন তন্ত্রে আছে "ইংরেজা লণ্ড্রেজা সর্ব্বসংগ্রামেষ্বপরাজিতা।"

সার রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমের পরিশিষ্টের প্রথমে তাঁহার একটী সংস্কৃত জীবনচরিত আছে তাহাতে এক স্থানে লিখিত আছে, "লর্ডনেচ তথা লেডীং * ক্যানিঙ্গেন বিশেষতঃ" আর একস্থানে লিখিত আছে, "ততঃ সর হবর্টমেডাক ডেপিঁডটী গবর্ণর।"† সার্ব্বভৌম মহাশয় যদি সংস্কৃতে ইংরাজমাহাত্ম্য লিখিতেন তাহা হইলে তাহা এইরূপ শ্লোকে পরিপূর্ণ হইত সন্দেহ নাই। যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত গ্রন্থ রচনা করিতেন তাহা হইলে তাহা হইতে প্রকৃত ইংরাজমাহাত্ম্য আমরা জানিতে পারিতাম না। যদি আমাদিগের পাঠকবর্গ প্রকৃত ইংরাজমাহাত্ম্য জানিতে চান তাহা হইলে "Torren's Indian Empire, how we come by it" দেখুন। তাহাতে যেমন ইংরাজমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে এমন অন্য কোন গ্রন্থে নাই। উহাতে ইংরাজেরা কি উপায়ে ভারতবর্ষ করায়ত্ত করেন, তাহা বিলক্ষণরূপে বিবৃত আছে। উহা পাঠ করিলে পাঠকবর্গ ইংরাজমাহাত্ম্য যেরূপ জানিতে পারিবেন এমন অন্য কোন গ্রন্থ পাঠ করিলে পারিবেন না।

রামনিধি তর্কবাগীশ।

ইনি ১০৫ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এত বয়সেও ইহাঁর মেধাশক্তি এতদূর প্রবলবতী ছিল যে কোন ব্যক্তি

---

* Lord and Lady Canning.

† Deputy Governor Sir Herbert Moddock.

তাঁহার নিকট ব্যবস্থা জানিতে আসিলে তিনি স্বীয় পুত্রকে বলিতেন, "ওহে! অমুক পুস্তকের অমুক পৃষ্ঠায় অমুক শ্লোকটা দেখিয়া ব্যবস্থা দেও।" তিনি এতদূর অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন যে ৭০।৭৫ বৎসর বয়সেও পুঁথি হাতে প্রত্যহ গ্রাম হইতে আড়াই বা তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী কালিঘাটে আসিয়া কোন দণ্ডীর নিকট বেদান্ত অভ্যাস করিতেন।

ষষ্ঠী ন্যায়লঙ্কার।

আমরা উপরে যে কতকগুলি প্রকৃত বিদ্বান ব্যক্তির বিবরণ দিলাম ষষ্ঠী ন্যায়লঙ্কার তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। তিনি একটী নিরেট মূর্খ ও মানবীয় সামান্য জ্ঞান বর্জ্জিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কপালের দীর্ঘ ফোঁটা ও অন্যান্য আড়ম্বর দেখিলে বোধ হইত যেন তিনি একজন প্রকাণ্ড পণ্ডিত। তিনি নিরেট মূর্খ হইয়া কি প্রকারে ন্যায়লঙ্কার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। ন্যায়লঙ্কার মহাশয় ছেলেবেলা অত্যন্ত আব্দারে ছেলে ছিলেন। ছেলেবেলা তিনি একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় চিনির পানা খাইবার বায়না করেন। ঘরে চিনি ছিল না, ষষ্ঠীর পিতা কি করেন ঠন্ঠনের হাটে গিয়া চিনি আনিয়া পানা করিয়া ষষ্ঠীকে তাহাব কিয়দংশ দেন আর অবশিষ্ট আপনি পরদিন পান করিবেন বলিয়া রাখিয়া দেন। ষষ্ঠী তখন আবার বায়না করিলেন যে বাবা ঐ

চিনি শুকিয়ে খাব। ষষ্ঠীর বাপের মহা বিপদ উপস্থিত হইল, রাত্রে চিনির পানা কি প্রকারে শুকাইয়া দিবেন, তখন প্রকারান্তরে ষষ্ঠীকে কিছু শুকনা চিনি দিয়া সে রাত্রের মত ছেলেকে থামাইলেন। আর একদিন অনেক রাত্রিতে ষষ্ঠী আব্দার করিলেন যে বাবা ঘোড়া চড়িব। ষষ্ঠীর বাপ মহাবিপদে পড়িলেন, একে ভট্টাচার্য্য মানুষ ঘোড়াতো নাই, তাহাতে আবার অতরাত্রে ঘোড়া কোথায় পান। যখন ষষ্ঠীর মাতা বলিল যে ছেলে যদি বায়না করিয়াছে তা তুমি একবার কেন ঘোড়া হওনা, তখন ষষ্ঠীর পিতা নিজে ঘোড়া হইলেন। আবার ষষ্ঠী আব্দার করিলেন যে ঘোড়ার সিং কই। ষষ্ঠীর বাপ ছেলেকে বুঝাইতে লাগিলেন যে ঘোড়ার কখন সিং হয় না। ছেলে কিছুতেই বুঝবে না, অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিল, তখন ষষ্ঠীর মাতা রাগ করিয়া বলিলেন যে ছেলে যখন আবদার করিয়াছে তুমি কেন আপনার দুটা সিং কর না। তখন ষষ্ঠীর পিতা অগত্যা সেই রাত্রে বাবুদের পুকুর হতে কাঁকড়ার মাটি আনিয়া আপনার দুইটা সিং করিলেন, তখন ষষ্ঠীর কান্না থামিল। এই ষষ্ঠী বড় হইলে তাহার পিতা একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন যে বাপু ষষ্ঠী তুমি এত বড় হইলে লেখাপড়া কি শিখিলে? রামায়ণ মহাভারত পড়িয়াছ তাহা কিছু বলিতে পার? ষষ্ঠী সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, জানি, তবে শুনুন। (কথকের সুরে কিন্তু

কিছু সানুনাসিক স্বরে) এক যে রামচন্দ্র ছিলেন তাঁর চৌদ্দটী হনুমান। শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন 'হে জানকি! আমি কল্য প্রত্যুষে হনুমান চারণে যাব।' জানকী তৎপর দিন অতি প্রত্যুষে রামচন্দ্রকে পান্তাভাত ও বড়ি পোড়া দিয়া অন্ন দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র রোদে পিট দিয়া পান্তাভাত ও বড়িপোড়া ভক্ষণ করিলেন। তৎপরে (টানাস্বরে) শ্রীরামচন্দ্র হনুমান চারণে গমন করিলেন। মাঠের মধ্যে রামচন্দ্র বৃক্ষোপরি আরূঢ় হইয়া হনুমান চারণ করিতে লাগিলেন। এখন (টানাস্বরে) রামচন্দ্রের তেরটী হনু ঘাস খায়, আর একটা হনু ঘাস খায় না। শ্রীরামচন্দ্র সেই হনুটাকে বলিলেন যে 'ওরে হোনো! ঘাস খা।' হোনো কোন প্রকারে ঘাস খায় না, তখন শ্রীরামচন্দ্র বৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বলিলেন যে 'ওরে হোনো! ঘাস খা।' হোনো তথাপি ঘাস খায় না। তখন শ্রীরামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া গালি দিতে লাগিলেন, 'ওরে দুর্ব্বৃত্ত দশানন! ওরে লম্বোদর গজানন! ওরে মলিম্লুচ! ওরে জরদ্গব! ওরে পাষণ্ড! ঘাস খা।' হোনো তথাপি শুনিল না, তখন শ্রীরামচন্দ্র চপেটাঘাতে মুষ্ট্যাঘাতে, হোনোকে পপাত ধরণীতলে করিলেন। ইতি কংসবধঃ।" ইতি কংসবধঃ বলাতে ষষ্ঠীর মহাভারতে যে ব্যুৎপত্তি আছে তাহাও তিনি জানাইলেন। ইটালীয় ভাষাতে "Extra vagaza" আখ্যাধারী যত প্রকার অদ্ভূত প্রবন্ধ আছে ন্যায়লঙ্কার

মহাশয়ের উপরে বিবৃত কথকতা তৎসমুদায়কে জিতিয়াছে সন্দেহ নাই।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

এক্ষণে বাঙ্গালীরা কত দেশদেশান্তর যাইতেছে, সাত সমুদ্র তের নদী পার বিলাত যাইতেছে, কেহ কেহ আট সমুদ্র চৌদ্দ নদী পার আমেরিকায় যাইতেছে। কিন্তু চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ যদি (Landour) লেণ্ডোর বা মসূরী পর্য্যন্ত যাইত, তাহা হইলে তাহাকে লোকে বীর পুরুষ জ্ঞান করিত। স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ ততদূর গিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার বীরত্ব আমরা কতদূর প্রশংসনীয় জ্ঞান করিতাম তাহা বলিতে পারি না। উক্ত ঘোষজা মহাশয় তাঁহার সময়ে ইংরাজীওয়ালাদিগের প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের উত্তীর্ণ এবং উক্ত কলেজে পঠনশীল যুবকদিগের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহারা সকলে রামগোপাল বাবুর বাটীতে একত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত ইংরাজীতে কথোপকথন করিতেন এবং ইংরাজী বিদ্যাবিষয়ক আলাপ করিয়া তৃপ্তিসুখ উপভোগ করিতেন। এই জন্য তিনি "এজুরাজ" বলিয়া খ্যাত ছিলেন। এই এজু শব্দ এডুকেটেড শব্দের অপভ্রংশ। ১৮৪৩ সালে যখন আমরা কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করি, তখন এক

দিন রামগোপাল বাবুর সহিত আমাদের পরামর্শ হইল যে তাঁহার Lotus ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া পূজার ছুটী বঙ্গদেশভ্রমণে অতিবাহিত করা যাইবে। তাঁহার লোটস ষ্টীমারটী ক্ষুদ্র, কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর, যথার্থই তাহা তাহার নামের উপযুক্ত ছিল। সেটাকে যথার্থ পদ্মের ন্যায় দেখাইত। বাষ্পীয় পোত আরোহণ করিয়া বঙ্গদেশের দূরস্থ স্থান ভ্রমণ করা তখন দুঃসাহসিক কার্য্য বলিয়া লোকে মনে করিত। এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে আমি প্রবৃত্ত হইব, পূর্ব্বে মাতা ঠাকুরাণী তাহা জানিতে পারিলে ভ্রমণে যাইতে দিবেন না, অতএব তিনি যাহাতে টের না পান অথচ কার্য্যটী সমাধা করিতে হইবে এই জন্য একটি ষড়যন্ত্র করিলাম। সে ষড়যন্ত্রের ভিতর কেবল আমি ও আমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর মহাশয় ছিলেন। স্থির হইল, মাতা ঠাকুরাণীকে বলা হইবে যে, আমি রামগোপাল বাবুর স্বগ্রাম বাঘাটী যাইতেছি, তাহার পর ক্রমে ক্রমে পিতা ঠাকুর যথার্থ কথা ব্যক্ত করিবেন। যে দিন আমরা বাষ্পীয় পোত আরোহণ করিব সে দিন উৎসাহের সীমা কি? সকাল সকাল আহারাদি করিয়া আমরা কয়জনে রামগোপাল বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তখন ব্যাগ নামক পদার্থ —যাহা এক্ষণে কাপড়, তরকারী, ফল, হুঁকা, তামাক প্রভৃতি [illegible]তের জিনিসে পরিপূর্ণ হইয়া ভদ্রলোককে ভদ্র মুটিয়াতে পরিণত করে—তাহার ব্যবহার ছিল না।

আমরা প্রত্যেকে এক একটি কাপড়ের মোট লইয়া ষ্টীমার আরোহণ করিয়া ত্রিবেণী পৌছিলাম। পূর্ব্বে ত্রিবেণী, বলাগড়, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান কি স্বাস্থ্যকর স্থানই ছিল! লোকে কলিকাতা হইতে জল বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য তথায় যাইত। এক্ষণে ঐ সকল স্থান মেলেরিয়ার আকর হইয়াছে। বাঘাটী ত্রিবেণীর নিকটস্থ গ্রাম। আমরা তথায় রামগোপাল বাবুর গ্রাম্য বাটিতে পূজার কয়েক দিন যাপন করিলাম। রামগোপাল বাবু নিজে পূজার কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন না; তাঁহার সম্পর্কীয় একটি বৃদ্ধ লোক পূজার সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতেন, কেবল শান্তিজল লইবার দিনে রামগোপাল বাবুকে শান্তিজল নিতে দেখিয়াছিলাম। এ কয়েক দিবস কেবল মেকলের রচনা-বলী (Macaulay's Essays) পাঠ করি। তখন আমরা মেকলে-খোর ছিলাম। তঁহাকে ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া বোধ হইত। এক্ষণে তাঁহার শত শত মহদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁহাকে কবিওয়ালা ও তাঁহার এক একটি রচনা (Essay) এক এক তান কবির ন্যায় জ্ঞান হয়। অমন পক্ষপাতী, একবগ্‌গা ও অত্যুক্তিপ্রিয় গ্রন্থকার অতি অল্পই আছে। তৎপরে ত্রিবেণীতে পুনরায় ষ্টীমার আরোহণ করিয়া আমরা মুরশিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলাম। দিনগুলি অতি আমোদে কাটান হইত। প্রাতে উঠিয়া চা, বিস্কুট ও ডিম খাওয়া হইত। মধ্যাহ্নকালে বাঙ্গালীতর ভাত, ডাল,

মাছের ঝোল; রাত্রিতে ইংরাজাতর অথবা হিন্দুস্থানীতর আহার হইত। সকাল বিকাল দুই বেলা তীরে নামিয়া আমরা পাখী মারিতে যাইতাম। সেই পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করা যাইত। একদিন রামগোপাল বাবু আমাকে একটি পিস্তল ছুঁড়িতে দিলেন। আমি বলিলাম "আমি পিস্তল কখন ছুঁড়ি নাই, ভয় হইতেছে পাছে হাতটা উড়িয়া যায়।" রামগোপাল বাবু বলিলেন "গেলই বা।" তখন ঐ কথা কঠোর বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি। আমরা ক্রমে, বঙ্গদেশের অক্সফোর্ড নবদ্বীপ পার হইয়া বিল্বগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে ষ্টীমারে উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য তথায় ষ্টীমার নোঙর করিলাম। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সে সময়ের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় একজন বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত প্রধান কবিতার সুকবি নাম বাসবদত্তা। তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। বিটন স্কুল যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন আপনার কন্যাকে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া এবং অন্যান্য প্রকারে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তাররূপ মহৎ কার্য্যে বিটন সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিটন সাহেব এজন্য তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং "My dear Madan" (প্রিয় মদন) বলিয়া পত্র লিখিতেন। ইনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "সর্ব্ব শুভকরী" নামে পত্রিকা

বাহির করেন। এই পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটী প্রস্তাব তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিল্বগ্রামের একজন ভট্টাচার্য্য হইয়া সমাজ-সংস্কার কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সহস্র সাধুবাদের উপযুক্ত। আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মুরশিদাবাদাভি-মুখে গমন করিলাম। আমরা মুরশিদাবাদের ঘাটে নোঙর করিয়াছি, এমন সময়ে নবাবের মাল বোঝাই করা একটি লম্বোদর ভড় কৃশাঙ্গী "লোটসের" উপর আসিয়া জোরে পতিত হয়। তাহাতে লোটসের বিলক্ষণ অঙ্গহানি হয়, লোটসের আরোহী কয়েকজন বীর পুরুষ ভড়ের উপর উঠিয়া মাঝিদিগকে উত্তম মধ্যম দেন। এইরূপ উত্তম মধ্যম দিয়া মুরশিদাবাদ সম্মুখে আর থাকা বিধেয় নহে জ্ঞান করিয়া ভাগীরথী ও পদ্মার সঙ্গম স্থলাভিমুখে ষ্টীমার চালান হয়। তৎপরে উক্ত সঙ্গমস্থল হইতে আমরা রাজমহলাভিমুখে যাত্রা করি। রাজমহলে পৌঁছিয়া তথায় মুসলমান নবাবদিগের নির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দর্শন করি। তন্মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহ-দালান প্রধান। এই দালানে বসিয়া নবাব প্রত্যহ দরবার করিতেন। ভূতপূর্ব্ব হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ইংরাজী সুকবি ও কাব্য-শাস্ত্রবিশারদ, সেক্স-

পিয়র প্রণীত নাটকের বিখ্যাত আবৃত্তিকারী আমাদিগের শিক্ষক সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন রিচার্ডসন এই সকল ভগ্নাবশেষ সম্বন্ধে যে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

এস হে, পথিক! হেথা এস এই স্থানে,
কালের নাশিনী গতি হের এই খানে।
যখন নিশীথ কালে পেচকের রব,
শ্রবণবিবরে আসি পশিবেক তব,
সুতীক্ষ্ণ চীৎকার ধ্বনি উঠিবে সঘনে
কৃশতনু শিবা হতে নির্জ্জন গগনে;
যদি হে! তোমার চিত্ত হয় হে তেমন
পবিত্র উৎসাহে পূর্ণ, কবিত্বে মগন,
কিম্বা জ্ঞান-চিন্তারত হয় তব মন,
এ ভগ্ন প্রাচীর তোমা বলিবে তখন,—
কি অনিত্য হয়, হায়! পার্থিব গৌরব,
মানব কীরিতি সহ গত হয় সব,
আশা ভরসা যত যৌবনের সাথে
হৃদয় ভগ্নাবশেষ রাখিয়া পশ্চাতে।

যখন রেলওয়ে রাজমহল পর্য্যন্ত হয়, তখন এই সকল ভগ্নাবশেষ রেলওয়ে এবং রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের বাসস্থান নির্ম্মাণ জন্য একবারে বিধ্বস্ত করা হয়। যখন এই বিধ্বংস কার্য্য চলিতেছিল, তখন আমি এই ভ্রমণের

১৭ বৎসর পরে রাজমহলে পুনরায় একবার যাই। তখন গিয়া দেখি মজুরেরা অতি কষ্টে নবাবদিগের অট্টালিকা সকল ভাঙ্গিতেছে। সেকালে অট্টালিকা সকল খুব মজবুত ছিল, এক্ষণকার অট্টালিকা সকল আদৌ সেরূপ মজবুত নহে। ইংরাজনির্ম্মিত অট্টালিকা সকলে শীঘ্র ফাট ধরে। রাজ-মহলের উল্লিখিত ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়া আমরা ষ্টীমারে আরোহণ পূর্ব্বক রাজমহলের পর্ব্বতের দিকে গঙ্গা নদীর যে খাড়ী গিয়াছে সেই খাড়ীর ভিতর দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়া উক্ত পাহাড় সকল পর্য্যবেক্ষণ করি ও পাহাড়িয়াদিগের বন্য গীত শ্রবণ ও বন্য নৃত্য দর্শন করি।

তৎপরে রাজমহল হইতে মহানন্দা-পদ্মা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলাভিমুখে গমন করি। এই পথে জলদস্যুর ভয় থাকাতে আমরা রাত্রিতে ষ্টীমারের ডেকের উপর ভাল করিয়া পাহারা দিতাম। আমি মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া তলওয়ার হাতে করিয়া পাহারা দিতাম। যখন আমরা মহানন্দার ভিতর প্রবেশ করিলাম, তখন তাহার পুষ্করিণীর জলের ন্যায় আকাশবর্ণ জল ও তীরস্থ শ্যামল বন উপবন দর্শন করিয়া মনে মহানন্দ উপস্থিত হইল। যখন মহানন্দা নদীর ভিতর ষ্টীমার অগ্রসর হইতে লাগিল তখন গ্রাম্য লোকেরা "ধোঁয়া কলের লা এয়েছেরে" "ধোয়া কলের লা এয়েছেরে" বালিয়া তীরে আসিয়া বাষ্পীয়পোত দর্শন

করি'তে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে বাষ্পীয়পোত কখন মহানন্দার ভিতর প্রবেশ করে নাই। লোকে তাহা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল এবং আমাদিগকে কোন শ্রেষ্ঠতর লোক হইতে সমাগত অদ্ভুত জীব মনে করিল। ষ্টীমার হইতে যখন গ্রামে কেহ দুধ কিনিতে যাইত, তখন সে গিয়া দেখিত, যে গ্রামের সমস্ত লোক পলায়ন করিয়াছে, গ্রাম শূন্য পড়িয়া আছে। একি ব্যাপার! আমরা ইহা দেখিয়া মনে করিলাম যে, আমরা কলম্বস ও তাঁহার সঙ্গীর ন্যায় কোন একটা নূতন আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছি; ও সেই আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ানগণ আমাদিগের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতেছে। ইহার মধ্যে এক দিন মহানন্দার তীরে আমরা রাত্রে নঙ্গর করিয়া আছি, এমন সময়ে বাঘের ডাক শুনা গেল। যখন আমরা ভোলাহাট নামক স্থানের সম্মুখে পৌঁছিলাম, তখন আমরা একটা "কড়কড়ে পানীতে" (Rapid) পড়িলাম। ষ্টীমার কোন মতে আর অগ্রসর হয় না। আমরা রামগোপাল বাবুকে বলিলাম, আর অগ্রসর হইবার আবশ্যক নাই, ঘরে ফিরিয়া যাওয়া যাক্। রামগোপাল বাবু অসমসাহসিক কার্য্য সকল করিতে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি বলিলেন, "ফিরিয়া যাওয়া আমাদের অভিধানে লেখে না, ষ্টীমারের কলে সম্পূর্ণ জোর দিয়া অগ্রসর হইতেই হইবে। তাহাতে বইল (Boiler) ফাটিয়া আমরা যদি আকাশে উড়িয়া যাই,

তাহাতে ক্ষতি নাই।” রামগোপাল বাবু বলিতেন যে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে যে, বন্দুকের গুলি তাঁহার শরীরের খুব নিকট দিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শও করে নাই। তিনি বলিতেন “আমি মন্ত্রপূত জীবন ধারণ করি।” (I bear charmed life)। ষ্টীমারে পূর্ণ জোর দিবার পূর্ব্বে ষ্টীমার হালকি করিবার জন্য ষ্টীমারের অধিকাংশ জিনিষ পত্র জালিবোটে করিয়া তীরে নামান হইল। ষ্টীমার স্বকীয় কলে সম্পূর্ণ জোর পাইয়া ভয়ানক গাঢ় বাষ্পরাশি পুনঃ পুনঃ উদ্গিরণ করতঃ ঈশ্বরেচ্ছায় “কড়কড়ে পানী” কোন প্রকারে পার হইল। নদীর দুই তীরে লোকে লোকারণ্য; যেমন পার হইল অমনি রামগোপাল বাবু রামমোহন রায়ের গান ধরিলেন, “ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যের ভয়,” কেবল “অন্যের” শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া “জলের” এই শব্দ ব্যবহার করিয়া গান গাইতে লাগিলেন,—“ভয় করিলে যাঁরে না থাকে জলেরই ভয়।” তৎপরে আমরা মালদহ নগরে উপস্থিত হইয়া তথাকার তদানীন্তন ডেপুটী কলেক্টর বাবুর বাসায় আতিথ্য স্বীকার করিলাম। তিনি আমাদিগকে সমাদরে তাঁহার বাসায় রাখিলেন। তথায় দুই এক দিন অবস্থিতি করিলে পরে গৌড়নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে সঙ্কল্প হইল। ঐ ভগ্নাবশেষ মালদহনগর হইতে আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত। উহা দেখিতে নিবিড় বনাকীর্ণ, আমাদিগের সঙ্গে যে কয়েকটি

বন্দুক ছিল, তদ্ব্যতীত আর কয়েকটি বন্দুক ও কয়েকটি হস্তী সংগ্রহ করা গেল। আমাদিগের সঙ্গে মালদহের তদানীন্তন সিবিল সার্জ্জন সাহেব জুটিলেন, তাঁহার নাম এতদিন পরে স্মরণ হইতেছে না, বোধ হয় Dr. Elton হইবে। এক হস্তীর উপর রামগোপাল বাবু ও ডাক্তার সাহেব এবং অন্যান্য হস্তীর উপর আমরা সকলে চলিলাম। তর্কালঙ্কার মহাশয় একটি হস্তীতে উপবিষ্ট ছিলেন-- কোট ও পেণ্টুলন পরা, হাতে বন্দুক, কিন্তু মাথায় টিকি ফর্‌ফর্ করিয়া বাতাসে উড়িতেছে! দৃশ্যটি দেখিতে অতি মনোহর হইয়াছিল। যাইতে যাইতে তর্কালঙ্কার হাতীর উপর হইতে পড়িয়া গেলেন। হাতীটি অতি সায়েস্তা ছিল, অমনি থমকিয়া দাঁড়াইল। আর এক পা নিক্ষেপ করিলে তর্কালঙ্কার মহাশয় চেপটিয়া যাইতেন। এইরূপে আমরা গৌড়ে উপস্থিত হইয়া কোতোয়ালি দরজা নামক সেকালের কোতোয়ালির ভগ্নাবশেষের মধ্যে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ঐ কোতোয়ালি দরজার খিলান অতি বৃহৎ। এ প্রকার খিলান, বোধ হয়, ভূমণ্ডলে অতি অল্প স্থানেই আছে। তৎপরে আহারের উদ্‌যোগ হইল। সাহেব ও রামগোপাল বাবু একত্রে আহার করিলেন, আমাদের বাঙ্গালীতর বন্দোবস্ত হইল। গৌড়ের জঙ্গলবাসী কতকগুলি লোক সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের নিকট হইতে আমরা মহিষের দুগ্ধ কিনিলাম এবং কয়জনে পড়িয়া

খিচুড়ি রাঁধিলাম। ভোজন সমাধা করিয়া আমরা ভগ্নাবশেষ দর্শনে বহির্গত হইলাম। আমরা দেওয়ান-খানা নামক একটি ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। এই খানে বাদসাহের প্রত্যহ দরবার হইত। প্রাচীরের উপরে অতীব সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখিলাম। সেই কারুকার্য্যের মধ্যে কোরান হইতে উদ্ধৃত কয়েকটা আরবী বাক্য খোদিত দৃষ্ট হইল। আমি যেন আমার সম্মুখে দেখিতে পাইলাম যে, বাদসাহ সিংহাসনে আসীন আছেন, আর উজীর ও অন্যান্য রাজ-কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবনতজানু হইয়া উপবিষ্ট আছেন, অনতিদূরে সুবিচারপ্রার্থী অসংখ্য মুসলমান ও হিন্দু দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তৎপরে চটকা ভাঙ্গিয়া গেলে বোধ হইল যেন আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। মনুষ্যের কীর্ত্তি কি অস্থায়ী! যে স্থান এরূপ জনতা ও লৌকিক কার্য্যের ব্যস্ততার আধার ছিল, তাহা এক্ষণে বিজন ও ভয়ানক হিংস্র জন্তুর আবাস হইয়াছে। তৎপরে আমরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কয়েকটি পুষ্করিণী দেখিলাম। সে সকল পুষ্করিণী এক একটি হ্রদের ন্যায়। তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ কুমীর ভাসিতে দেখা গেল। এক স্থানে আমরা কলিকাতার অক্টারলনী মনুমেণ্টের ন্যায় একটি অত্যুচ্চ স্তম্ভাকৃতি গৃহ দেখিলাম। শুনিলাম যে, তাহার উপর রাজ-জ্যোতির্ব্বেত্তা রাত্রে উঠিয়া নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। আমার ক্ষণেকের জন্য স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইল, যেন অদ্যাপি রাত্রে উষ্ণীষধারী

ও আপাদলম্বিত আলখাল্লাপরিহিত রাজ-জ্যোতির্ব্বেত্তা নভোমণ্ডলে দূরবীক্ষণ নিয়োগ করতঃ নক্ষত্রপর্য্যবেক্ষণকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। এইরূপ অন্যান্য অনেক ভগ্নাবশেষ দেখা গেল। এই সকল ভগ্নাবশেষের বিশেষ বৃত্তান্ত র্যাবেন্‌শা (Ravenshaw) সাহেব সম্প্রতি তাঁহার প্রণীত "রুইন্‌স্ অব্ গৌড়" (Ruins of Gour) নামক গ্রন্থে সবিশেষ বিবৃত করিয়াছেন। এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আমরা মালদহ নগরে প্রত্যাগমন করিলাম। সে দিবস সাহসী রামগোপাল বাবু ও ডাক্তার সাহেব ব্যতীত আর সকলের সৌভাগ্যক্রমে ব্যাঘ্র কিংবা অন্য কোন হিংস্র জন্তুর সহিত মোলাকাৎ হয় নাই, তাহা হইলে আমাদিগের মধ্যে যে কয়জন অপদার্থ ভীরু বাঙ্গালী ছিল, তাহাদিগের দুর্দ্দশা কি হইত বলা যায় না।

সম্পূর্ণ।